নাজাতুন নিসওয়ান

মহিলাদের মুক্তির পথ

মাওলানা তারিক জামিল

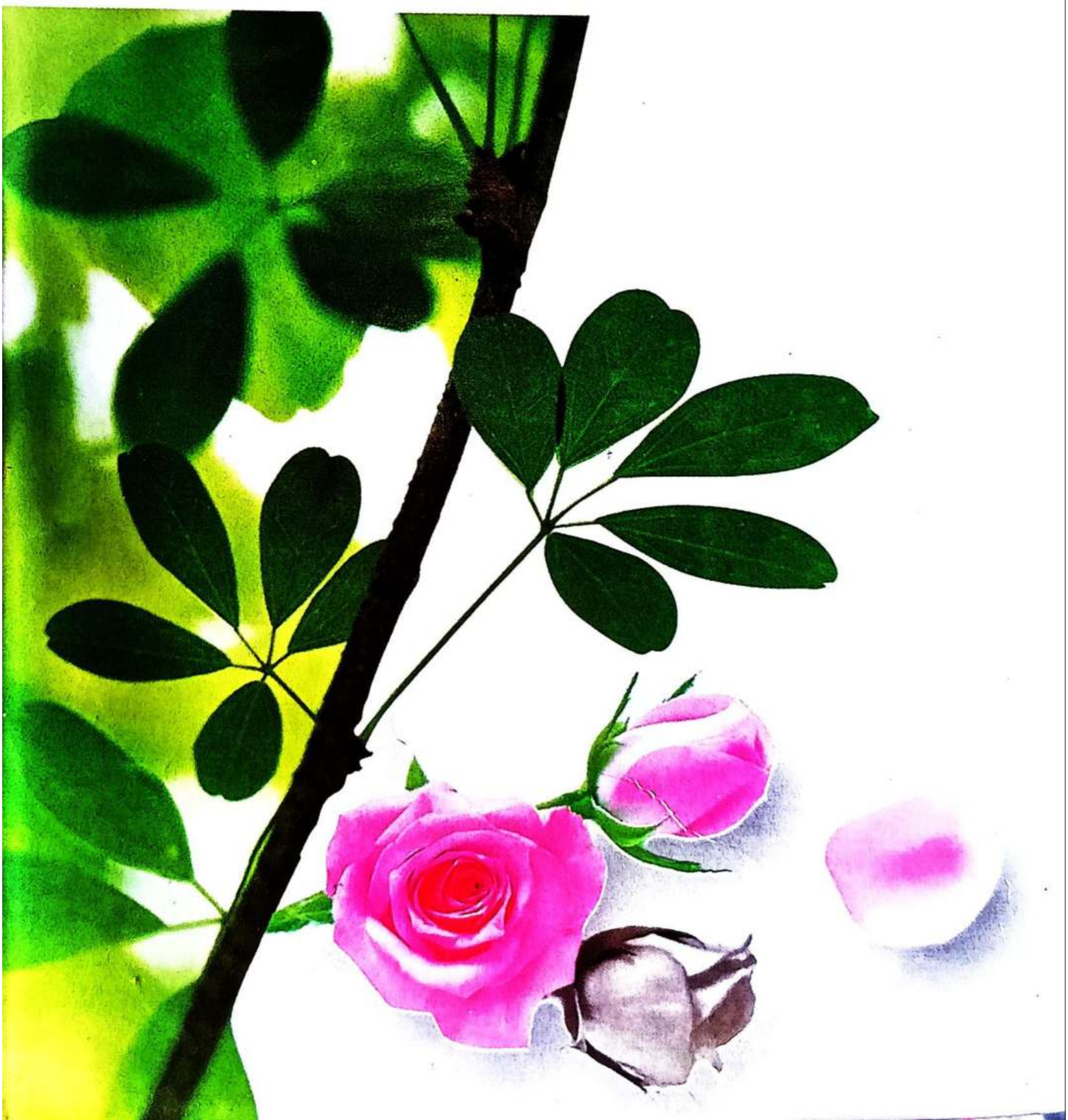

নাজাতুন নিসওয়ান

বা

মহিলাদের মুক্তির পথ

মূল

মুবাল্লিগে ইসলাম

মাওলানা তারিক জামিল

অনুবাদ ও সংকলন

মাওলানা কাওসার বিন নূরুদ্দীন

দাওরায়ে হাদীস ঃ হুসাইনিয়া আশরাফুল

উলূম মাদরাসা, বড়কাটারা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

বিননূরী লাইব্রেরী

পাঠকবন্ধু মার্কেট

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মহিলাদের মুক্তির পথ

মাওলানা তারিক জামিল

প্রকাশক
মাওলানা নূরুদ্দীন ফতেহপুরী

প্রথম প্রকাশ
বিশ্ব ইজতেমা ২০১৩ ইং
সংশোধিত সংস্করণ-২০২০ ইং

প্রকাশনায়
বিননূরী লাইব্রেরী
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১৭২২৩৫৫৫৯৭

প্রাপ্তিস্থান
তাবলীগী কুতুবখানা
দারুল কিতাব   তাবলীগী কুতুবখানা
পুস্তক ঘর   দারুল বালাগ
পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এ ছাড়াও নিম্নোলিখিত লাইব্রেরীতে পাওয়া যাবে–
মক্কা পাবলিকেশন্স   কুতুবখানায়ে রশিদিয়া
আল মাহমুদ প্রকাশন   দারুল হাদীস
আশরাফিয়া বুক হাউজ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

[সর্বস্বত্ব অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত]

I.S.B.N. 978-984-90309-1-4

মূল্য ঃ ১৬০/= (একশত ষাট) টাকা মাত্র

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا۔

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যারা আমাদের চোখের প্রশান্তি হবে। আর তাদের আল্লাহভীরুদের নেতা বানিয়ে দিন।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

জীবনের লক্ষ্য ---------- ৯
দ্বিতীয় টি হলো শয়তানী রাস্তা ---------- ১১
আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মৃত্যুতে জমিন কাঁদে ---------- ১২
মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকায় আল্লাহর খুশী ---------- ১৩
লজ্জাশীলতা আজ উধাও ---------- ১৪
আমার চেয়ে ভালোবাসা দেওয়ার মতো কেউ কি আছে? ---------- ১৭
আমার সব কিছুতো আল্লাহর জন্য হওয়া চাই ---------- ২০
হে মুসলিম নারী! হুঁশে আসো ---------- ২১
অন্তরতো অন্ধকার হয়ে গেছে ---------- ২২
চরিত্রবান হতে হবে ---------- ২৫
এক তাবেঈর চরিত্রের দৃঢ়তা ---------- ২৭
অপরকে ছোট না করি ---------- ২৯
বেহায়াপনা আল্লাহ সহ্য করেন না ---------- ৩৬
প্রিয় বোনেরা! পর্দায় আসুন ---------- ৩৭
আযাদী না সর্বনাশ? ---------- ৩৮
আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে হবে ---------- ৪০
কুরআনে বর্ণিত নূহ (আ.)-এর কওমের ঘটনা ---------- ৪৩
মহা প্লাবন ---------- ৪৩
কওমে আদ এর উপর গজব ---------- ৪৪
কওমে শোয়াইব-এর উপর ভয়াবহ গজব ---------- ৪৭
আজ যা করার করো, কিন্তু... ---------- ৪৯
গোনাহ ছাড়ো সব জায়গায় ইজ্জত পাবে ---------- ৫৩
চোখের পানির মূল্য ---------- ৫৫
হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর বিয়ে ---------- ৫৬

সে উপমাময় বিবাহ -- ৫৮
হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) ---------------------------------- ৬০
সন্তানকে চরিত্রবান বানান ---------------------------------- ৬৩
পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে------------------ ৬৬
তোমরা পাশ্চাত্য নারীদের অনুকরণ করো না--------------------- ৬৭
পর্দায় থাকো, পর্দার সাথে চলো------------------------------- ৭০
জান্নাতে মুসলিম নারীর মর্যাদা -------------------------------- ৭১
মু'মিনের পরিচয় --- ৭২
কামিয়াবীর পথ -- ৭৩
সফলতার প্রথম শর্ত ইসলাম ---------------------------------- ৭৩
সফলতার দ্বিতীয় শর্ত-- ৭৪
সফলতার তৃতীয় শর্ত-- ৭৬
সফলতার চতুর্থ শর্ত--- ৭৭
সফলতার ৫ম শর্ত -- ৭৮
সফলতার ষষ্ঠ শর্ত -- ৭৯
সপ্তম শর্ত -- ৮০
পর্দার গুরুত্ব তাঁরা বুঝেছিল ---------------------------------- ৮৩
আল্লাহপাকের মুহব্বত -------------------------------------- ৮৫
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ------------------------- ৮৮
গীবত বা পরনিন্দা -- ৯০

অধ্যায়-২

জান্নাতী নারী --- ৯৪
আদর্শ স্ত্রী --- ৯৬
আসুন নামাযী হই -- ৯৯
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নারীর পরিচয় ---------------------------------- ১০৪
স্বামীর সন্তুষ্টিতে স্ত্রীর জান্নাত ---------------------------------- ১০৪
সফলতার তিনটি সবক ------------------------------------- ১০৬
আদর্শ নারীর কয়েকটি গুণ ---------------------------------- ১০৬
চারিত্রিক সৌন্দর্য-- ১০৭

অধ্যায়-৩

মহিলা সাহাবী ও আউলিয়ায়ে কেরামগণের ঈমানদ্বীপ্ত জীবনকথা---- ১১০
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-
এর প্রতি এক মহিলা সাহাবীর অনুপম ভালোবাসা ------------------ ১১১
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য --------------- ১১২
আটা দিয়ে রুটি ও গোশত ------------------------------------- ১১৩
ফেরাউনের দাসী --- ১১৩
এক বাঁদী ও মালেক বিন দীনার --------------------------------- ১১৪
অশ্রুঝরা কাহিনী --- ১১৭
আদর্শ একটি বিয়ে --- ১১৮
বুকের রক্তে পায়ে মেহদী লাগাই ------------------------------- ১২১
অটুট ঈমান -- ১২৪
এক মহিলার দোয়ায় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিলো ------------- ১২৫
এক বৃদ্ধা মহিলার নবীপ্রেম ------------------------------------ ১২৮
ফেরাউনের ঘরে ঈমান --------------------------------------- ১২৯
জান্নাতী নারী --- ১৩১
হযরত সুফিয়ান সাওরীর মা ----------------------------------- ১৩৩
বখতিয়ার কাকীর ঘটনা -------------------------------------- ১৩৫
মু'আয আদাবিয়ার বিস্ময়কর ইবাদত -------------------------- ১৩৬
ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মায়ের তাকওয়া ----------------------- ১৩৬
ক্ষুধা --- ১৪১
আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা সবার উপরে ----------------------- ১৪২
হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর ঘটনা ----------------------------- ১৪৪
এক মায়ের কৃতিত্ব --- ১৪৫
মু'মিন নারীর ঈমানী জযবা ------------------------------------ ১৪৮
হযরত উমর (রাযি.)-এর তাকওয়া ----------------------------- ১৪৯
একটি চমৎকার ঘটনা --------------------------------------- ১৫২
হযরত হাজেরা (আ.)-এর ধৈর্য -------------------------------- ১৫৪
বিস্ময়কর স্বপ্ন --- ১৫৫
পাপী মহিলার তওবা --------------------------------------- ১৫৬
আল্লাহ তা'আলার রহমতের নমূনা ----------------------------- ১৫৬
অপূর্ব দ্বীনদারী -- ১৫৭

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ـ اَمَّا بَعْدُ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মহান রাব্বুল আলামীন কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামকে তার মনোনীত ধর্ম হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম। রাসূলে আকরাম (সা.) অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে। আর উম্মতকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন এ দ্বীনকে সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিতে। প্রত্যেকটা মুসলমানের এ দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য। আর এ দায়িত্ব পালনে যদি মুসলমানরা অবহেলা করে তাহলে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে।

আজ বড়ই পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা তাদের দায়িত্ব ভুলে গেছে। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে পরকালের কথা ভুলে গেছে। ভুলে গেছে দাওয়াতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের কথা। আজ পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত। এইসব মানুষদেরকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর দ্বীনের পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব আমাদের সব মুসলমানের। আমার আপনার দায়িত্ব ছিল এসব বে-দ্বীন মানুষদেরকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আল্লাহর পথে জুড়ে দেওয়া।

আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহর সাথে জুড়ে দেওয়ার এ মহান কাজই সম্পাদন করছে বিশ্ব তাবলীগ জামাত। নিঃস্বার্থভাবে যারা পথ ভোলো৷ বান্দাদের আল্লাহর পথে ডাকছে। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে হাজার হাজার মুবাল্লিগ ছুটে চলছেন পৃথিবীর পথে পথে।

তেমনই একজন মুবাল্লিগ মাওলানা তারিক জামিল (দাঃ বাঃ)। তিনি এমন একজন দাঈ; যার হৃদয় সর্বক্ষণ উম্মতের ফিকিরে বেচাইন। উম্মতের এ সময়কার দুরাবস্থা তাকে বেচাইন করে তোলে। তাই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

মাওলানা তারিক জামিলের বয়ান হৃদয়স্পর্শী। তার বয়ান শ্রোতাদের সম্মোহিত করে রাখে। মাওলানার অক্লান্ত মেহনত ও দাওয়াত এবং হৃদয়স্পর্শী বয়ানের বদৌলতে শত শত পুরুষ মহিলা তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছেন।

মহিলাদের মুক্তির পথ নামক এ কিতাবটি মাওলানা তারিক জামিল সাহেবের এমনই কিছু বয়ানের নির্বাচিত অংশ। যা তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। মাওলানা তারিক জামিলের সেসব বয়ানগুলোকেই বাংলায় রূপান্তরিত করে আপনাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। আমরা আশা করি, মাওলানা তারিক জামিলের হৃদয়স্পর্শী এসব মূল্যবান কথাগুলো মা ও বোনদের হৃদয়ে হেদায়েতের নূর হয়ে জ্বলবে। ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। জানালে সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ।

আমি আমার এ ক্ষুদ্র মেহনতের সবটুকুই মু'মিন হৃদয়ের আশার আলো, পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় চমকিত, সাগরের ন্যায় প্রশস্ত, আকাশের মত প্রশস্ত সত্তার অধিকারী, মদীনার পরশ-মানিক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র চরণে নাযরানা পেশ করলাম। আর এর সওয়াব ও প্রতিদান কিছু থাকলে তা আমার মুহ্তারাম পিতা-মাতা ও সারে তাজ আসাতিযাগণের সমীপে নিবেদন করলাম। হে আল্লাহ্! আপনি কবূল করুন। আমীন।

বিনয়াবনত

–কাওসার বিন নূরুদ্দীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায়-১

জীবনের লক্ষ্য

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً۔

মু'মিন নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কেউ সৎ কাজ করবে, আমি তাকে নিশ্চই পবিত্র জীবন দান করব। (সূরা নাহল-৯৭)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর এ প্রতিশ্রুতি হলো সৎ কর্ম, আর নেক আমলের বিনিময়ে। এই প্রতিশ্রুতি যেমন নারীর জন্য প্রযোজ্য, তেমনি পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য। এখানে নারী পুরুষের ভেদাভেদ নেই। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রাপ্তির রাস্তা হলো দৃঢ় ঈমান। আর পরিচ্ছন্ন নেক আমল। হাশরের বিচারের দিনেও মহান রাব্বুল আলামীন বিচার করবেন নেক আমল ও ঈমানের ভিত্তিতে। সেদিন মানুষ ঈমানের ভিত্তিতেই সফলতা লাভ করবে। আর নেক আমলগুলো ঢাল স্বরূপ সুরক্ষা করবে।

তাহলে আমাদেরকে সেই পবিত্র জীবন লাভ করতে হলে যে কোনো মূল্যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আমাদের জীবন মরণ সব কিছুইতো হতে হবে তাঁর বিধানের অধীনে। তাঁর প্রিয় হাবীবের পথইতো হবে আমাদের জীবন চলার একমাত্র পথ।

আজ পৃথিবীর রং-রূপ আমাদের চোখকে ঝলসে দিয়েছে। আমাদের হৃদয়কে আল্লাহর ভয় থেকে গাফেল করে দিয়েছে। চিন্তা-চেতনা দ্বীন ইসলাম থেকে দুরে সরে গেছে। ভেতরটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে।

আমাদের চলা ফেরায় আচার-আচরণে নবী আদর্শের ছিটে ফোটা ও নেই। মুসলমান নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াই কিন্তু অন্তর তো দ্বীন থেকে খালি। মুসলমান আছে, মুসলমানি গুণ নেই। প্রকৃত অর্থে আমাবশ্যার রাতের চাইতেও গাড় আঁধার বিরাজ করছে আমাদের হৃদয়ে।

যে হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা নেই, যে হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার নামের আকুলতা নেই। যে হৃদয়ে রাব্বুল আলামীনের ভালোবাসার আকর্ষণ নেই, যে হৃদয় রাতের গভীরে জায়নামাযে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে না, যে হৃদয় কপালকে জমিনে টেনে নিয়ে যায় না, যে হৃদয় পাপী অন্তরকে আল্লাহর ভয়ে অনুতাপের অশ্রু বিসর্জন দিতে দেয় না, সে হৃদয় তো হৃদয় নয়। সে হৃদয় তো পাথরের চেয়েও কঠিন।

বোনেরা! আজ যারা স্ত্রী, তারা তাদের স্বামীদের ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদন করছে। পিতা-মাতা সন্তানের ভালোবাসার স্বাদ গ্রহণ করছে। এই জগতে আমরা সকলেই অর্থকড়ি ও সোনা রূপার স্বাদ চেখে দেখেছি। কিন্তু যে জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করিনি, তা হলো আল্লাহর ভালোবাসা। প্রভু প্রেমের মজা, আনন্দ। আজ আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসায় অশ্রু বিসর্জনের কষ্ট ভোগ করার নেয়ামত নেই। তাই আমাদের হৃদয় আজ বন্ধা হয়ে গেছে। আমাদের হৃদয় আজ খা খা মরুভূমি। চোখ আলোকিত। ঘর-বাড়ি জীবন কত উজ্জ্বল, কিন্তু হৃদয় আমাবশ্যার রাতের অন্ধকারের চেয়েও বেশি আঁধারে নিমজ্জিত।

আজ আমি আমার মুসলমান বোনদের, মুসলমান ভাইদের শুধু এটুকু বলতে চাই,আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য তো হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসাই হলো আমাদের জীবনের মূল পুজি। এই পুজিকে সামনে রেখেই মূলত আমাদের সামনে অগ্রসর হতে হবে।

প্রিয় বোনেরা!

মহান রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতে মানুষের জন্য দু'টি পথ করে দিয়েছেন। মানুষের জীবন চলার জন্য দু'টি পথ। দু'টি পদ্ধতি। দু'রকমভাবে জীবন যাপন। কিছু মানুষ তো এমন আছে, যারা নিজেরা আল্লাহর রেজামন্দির জন্য জানমাল কোরবান করে দেয়। কেনো দেয়? আল্লাহ তা'আলার রাজি ও খুশীর জন্য।

আরেক প্রকার মানুষ আছে, যারা দুনিয়াতে মন্দ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিকে খরিদ করে, আল্লাহকে রাগান্বিত করে। আল্লাহর অভিসম্পাত কুড়ায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থাকে বাজারের লেনদেনের সাথে তুলনা করেছেন। বলেছেন "যে, দ্বীনের বাজার ও গরম। সকল মানুষ এ বাজারে বেচাকেনা করছে, কেউ বিক্রয় করছে, কেউ ক্রয় করছে। কিছু লোক তারা, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য বিক্রয় করছে, নিজেদের আজাদী (মুক্তি) ক্রয় করছে।

কিছু লোক তো এমন, যারা নিজেদের জন্য ক্রয় করছে ধ্বংস, বরবাদী।

এই দুই জীবনের মধ্যে পছন্দনীয় হলো, আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সা:) এর পথ। اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ এর সাথে এ পথ তো আল্লাহ তা'আলাই নির্বাচিত করেছেন। ইসলাম হলো আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় তরীকা।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ইসলামই একমাত্র ধর্ম। এ ধর্ম ছাড়া কোনো পন্থাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। (আলে ইমরান : ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ইসলাম ছেড়ে যে কোনো তরীকা অবলম্বন করবে, সে আল্লাহর দরবারে মারদুদ হয়ে যাবে। (আলে ইমরান : ৮৫)

এরপর আবার বলা হয়েছে, اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً আসো, প্রবেশ করো পুরাপুরি। এমন নয় যে এক পা ভিতরে, আরেক পা বাইরে, কিছু আল্লাহর আইন মানি, কিছু নিজের মনগড়া। কিছু আল্লাহর রাসূল (সা:) এর পথ, কিছু নিজের তৈরি মতবাদ। এমন পন্থা অবলম্বন করা যাবে না।

দ্বিতীয়টি হলো শয়তানী রাস্তা

দ্বিতীয় রাস্তা হলো বরবাদী ও ধ্বংসের। যেমন আল্লাহ বলেন لَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ শয়তানের অনুসরণ করো না। আরও বলেন اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ রাস্তা হলো দু'টি।

اِمَّا شَاكِرًا শোকুর গুজারী করা, ইসলামী তরীকায় চলা।

وَاِمَّا كَفُوْرًا অকৃতজ্ঞতা, শয়তানী রাস্তায় চলা। (সূরা দাহার)

فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ আমি তোমাদের দু'টি পন্থা বলেছি, দু'টি রাস্তা দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ)

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا তোমাদের মাঝে আমি শক্তি দিয়েছি, সে শক্তি তোমরা মন্দ কাজেও ব্যবহার করতে পার ভালো কাজেও ব্যবহার করতে পার। (সূরা শামস্)

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মৃত্যুতে জমিন কাঁদে।

জীবন যেখানে আছে মৃত্যু সেখানে আসবেই।

اِنَّ الْاَرْضَ تَبْكِيْ عَلَى الْاِنْسَانِ وَتَبْكِيْ لِلْاِنْسَانِ এমন কিছু লোক আছে, যাদের মৃত্যুতে জমিন কাঁদে, এই জন্য কাঁদে, এই বলে কাঁদে, হে আল্লাহ! সে কেন মারা গেলো বড় ভালো মানুষ ছিলো। তোমার প্রিয় বান্দা ছিলো, নেককার ছিলো, সে মরে গেলো। সে কোরআন তেলাওয়াত করতো। সে জিকির করতো। সে তাহাজ্জুদ পড়তো।

তার তাক্বওয়া, খোদাভীতি তার সব কিছু আমার বুকটাকে সজিব রাখত। সে আমার বুকে সুগন্ধিযুক্ত একটি ফুল ছিলো। যার সৌরভে আমার বাগান মাতোয়ারা থাকত, আজ তার মৃত্যুতে সে বাগান উজাড় হয়ে গেলো।

আর মন্দ লোকের বেঁচে থাকাটা জমিনের অসহ্য লাগে। এজন্য সে কাঁদে। বলে تَبْكِيْ الْاِنْسَانُ يَا اللّٰهُ হে আল্লাহ! এ অত্যাচারী জালেম কবে মরবে?

সে ব্যভিচার করে আমাকে নাপাক করে দিচ্ছে।

সে চুরি করে আমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এ মিথ্যাবাদী

মা-বাবার আবাধ্য সন্তান। সমস্ত হারাম কাজ সে আমার বুকে বসে করছে। সেই জালেম কবে মরবে? কবে এ বোঝা আমার বুক থেকে নামবে। আমার মুক্তি মিলবে।

আমার বোনেরা!

আজ সমাজে এমন মানুষতো অভাব নেই, যাদের জন্য জমিন প্রতি নিয়ত আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, হে আল্লাহ্। এ জালেম আমার অন্তরটা জালিয়ে দিলো। তার চুরি, তার ব্যাভিচার তার রাহাজানি, তার হত্যা তার সুদ, ঘুষ, মিথ্যা বলা, মা-বাবার নাফরমানি, অহংকারী, হিংসা, গানবাদ্যে মশগুল, সব রকমের কবীরা গোনাহ তারা করছে। জমিন তাদের সম্পর্কে বলে, আল্লাহ এ জালেম কবে মরবে। সে মারা গেলে আমার বোঝা হালকা হয়।

মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকায় আল্লাহর খুশী

প্রিয় বোনেরা!

দুনিয়াতে কিছু মানুষতো এমন আছে, যাদের সৎকর্মগুলো এ জমিনটাকে শিথিলতা দান করে। যাদের নেক আমালে জমিন উৎফুল্ল হয়। এই ভালো মানুষগুলো আল্লাহর প্রিয় নেক বান্দাগুলো যেদিক দিয়ে হাটে, যেখানে তাদের পা পড়ে, সে দিকের মাটি শীতল হয়ে যায়। যে বাতাস তার শরীর স্পর্শ করে, তা হয়ে উঠে নির্মল তাজা। সে যে স্থানে সেজদা করে, তার তলদেশ পর্যন্ত সে জমিনের কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সে যেখানে বসে তেলাওয়াত করে, তার আশপাশ হয়ে উঠে উজ্জল, সুরভিত।

যখন দৃষ্টি অবনত করে বাজারে যায়, বাজারের দ্রব্যগুলো তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। বলতে থাকে, কে যায় এমন নেক বান্দা? এমন নত মস্তকে। লজ্জাশীলতার উজ্জল দৃষ্টান্ত। এ বাজারতো ভরে গেছে নির্লজ্জ আর অহংকারী মানুষে। জমিন তার পায়ে চুমু খায়।

বাতাস তার শরীর ছুঁয়ে ধন্য হয়। আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাকে দেখে আনন্দিত হয়। আল্লাহ তা'আলাও খুশী হন। ফেরেশতাদের বলতে থাকেন, দেখো। আমার এক বান্দা, যে লজ্জাশীলতার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। সে আমার ভয়ে আমার জমিনে কেমন নত মস্তকে চলা ফেরা করে। আমার ভয়ে আমার ভালোবাসায় সে অহংকার ত্যাগ করেছে। গোনাহ থেকে বেঁচে চলে আমার রাজি ও খুশীর জন্য।

হাদীসে কুসসিতে আল্লাহ বলেন,

يَا ابْنَ اٰدَمَ جَعَلْتُ لَكَ عَيْنًا وَجَعَلْتُ لَهُمُ الْغِطَاءَ فَنَظَرَ عَيْنَيْكُمَا اَحللته لَكَ فَإِنْ انظر كَمَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَابْقِ عَلَيْهَا الْغِطَاءَ۔

হে বনী আদম! আমি তোমাকে দু'টি চোখ দিয়েছি, তার উপর দু'টি পর্দা দিয়েছি। এই চোখ দু'টি দিয়ে দেখো, কোনটা হালাল এবং কোনটা হারাম। যখন হারাম কোনো কিছু নজরে আসবে, তখন চোখ দু'টি বন্ধ করে ফেলো।

এই পর্দা আমি এজন্য দিয়েছি যেন, তুমি চোখ দিয়ে হারাম না দেখো। চোখ দিয়ে ভুল না দেখো। এমন দৃষ্টি অবনত যে লোক কোনো

বাজারে যাবে, কোনো রাস্তায় চলাচল করে, তখন সে গলি, সে বাজার সুরভিত হয়ে উঠে, সে গলি আলোকিত হয়ে যায়। কোনো বাগানে গেলে সে বাগানের উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়। জমিন ও আসমানে তার জন্য ধন্য ধন্য রব উঠে।

লজ্জাশীলতা আজ উধাও

প্রিয় বোনেরা!

আজতো মানুষের মাঝে লজ্জাশীলতা নেই বললেই চলে। দুনিয়া বিগড়ে গেছে। মনুষত্ব মরে গেছে। নারী স্বত্বা মরে গেছে, নামকাওয়াস্তে কিছু পুরুষ আছে। আছে কিছু নামকাওয়াস্তে মহিলা। মানুষের অন্তর থেকে হায়া শরম লজ্জাশীলতা বিদায় নিয়েছে। সেই রাবেয়া বসরীর জীবনাচার আজ নারী জাতির মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে। সেই আদর্শ সেই খোদাভীরুতা সেই গোলামী আজ নেই। আরও কত নারী রাবেয়া বসরীর মত মাওলা পাকের দরবারে তাঁর ভয়ে তাঁর ভালোবাসায় সারা রাত কাঁদত। যাদের শেষ রাতের কান্নায় আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোয়ার উঠত। সেই নারীদের লজ্জাশীলতায় আসমানের ফেরেশতাগণ লজ্জা পেতো। কোথায় আজ সেই নারীরা? আজ আমাদের সমাজে কত রকম অশান্তি। মেয়েরা বাইরে যাচ্ছে পর্দা ছাড়া। সন্তান মায়ের কথা শুনছেনা, পিতার নিষেধ মানছেনা। বেহায়া বেলেল্লাপনায় ভরে গেছে। রাস্তায়, যানবাহনে, ঘরের ছাদে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, বাজারে সব জায়গায় আজ অশ্লীলতার সয়লাব। এগুলো দেখে দেখে মানুষের চোখগুলোও আজ নির্লজ্জ হয়ে গেছে। সবাই দেখছে। স্ত্রী কোথায় যায় কার সাথে যায় স্বামীর খবর নেই, স্বামী কোথায় যায় কি করে স্ত্রীর খবর নেই। আর ছেলে মেয়েদের তো আজকাল কিছু বলাই যায় না। তারা এ যুগের মেয়ে ছেলে, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার সাধ্য কার?

আজ মুসলমান ঘরের মেয়েদের পোষাকের অবস্থা দেখলে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। অথচ এই মুসলিম নারীদের লজ্জাশীলতায় ফেরেশতাগণও লজ্জা পেতো। সেই উম্মতের মেয়েরা আজ পায়ে নুপুর পরে নাম মাত্র পোষাক পরে শতশত পুরুষের সামনে নাচছে। অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই। আযাবের ভয় নেই, গজবের ভয় নেই। যদি আল্লাহ

রাব্বুল আলামীন 'রাহমানুররাহীম' না হতেন, তাহলে এমন পাপী বান্দার পা যেখানে পড়ে, সে মাটিকে পাতাল পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিতেন।

বোনেরা!

আজ আল্লাহর ওয়াস্তে নিবেদন, সেই মহান রবের নামে, যিনি আমাদের আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। সেই আল্লাহর নামে যে আল্লাহ আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। সেই আল্লাহর নামে বলছি, দয়া করে এ পথ থেকে ফিরে আসুন। আল্লাহর নিষেধ মেনে চলুন।

আর কত এভাবে নিজের চোখকে নিষিদ্ধ কাজ অবলোকন করাবেন?

আর কত নিজের কানকে গান-বাজনা শ্রবণ করাবেন? নিজের জবানকে আর কত লাগামহীন করে রাখবেন? পা দু'টিকে আর কত পাপের মজলিসে নিয়ে যাবেন? আর কত দিন ভুলটাকে শুদ্ধ ভেবে পাপে লিপ্ত থাকবেন?

মিথ্যা আর কতদিন?

সুদ ও ঘুষ আর কত?

নাচ গানের মধ্য মনি আর কত?

আরে মৃত্যুতো আসবেই। নাকি আসবে না?

সময় কি খুব বেশি আছে? জীবনের চাকা কি স্থায়ী? আল্লাহর ফেরেশতা কি আমাকে দেখছেনা? আজরাইল-কি আমাকে দেখছেনা? সে আমাকে ধরার জন্য প্রস্তুত।

আসুন সেই মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর শোকুর গুজারী করি।

যে আল্লাহ আমাদের পরিপূর্ণ মানুষ করে তৈরি করেছেন। যে আল্লাহ আমাদের সুস্থতা দান করেছেন।

যে আল্লাহ আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন, কোনো বে-দ্বীন কাফেরের ঘরে পাঠাননি।

যে আল্লাহর দয়ায় আমার হাত পাগুলো সচল। যদি একটি হাত বা একটি পা না দিতেন কি করার ছিল?

জবানে যদি কথা বলার শক্তি না থাকত, কি সাধ্য ছিলো আমার কথা বলার?

নিজের উপর রহম করুন।

তাই বলছি, এ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা করতে শিখি। হাত জোড় করে বলছি আল্লাহকে নারাজ করবেন না। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার সবচেয়ে বড় দুশমন এখানে বসা। তোমার অন্তরে বসে আছে। তোমার সাথে ঘুরছে। আল্লাহর ওয়াস্তে সে দুশমনকে পরাজিত করো। সে হলো শয়তান, তাকে দুশমন মনে করে তার সঙ্গ ত্যাগ করো।

তাহলে আল্লাহ পাক রাজি হবেন। তিনি খুশী হবেন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খুশী হবেন। ফেরেশতাগণও আপনার জন্য কোরবানি হবেন। আপনাকে সালাম দেবেন। যদি অন্তরকে শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্ত করতে পারেন।

আল্লাহ বলেন,

يَا ابْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُ الْاَشْيَاءَ لِاَجْلِكَ وَخَلَقْتُكَ لِاَجْلِيْ۔

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে বনি আদম! সমস্ত দুনিয়া আমি তোমার জন্য তৈরি করেছি। আর তোমাকে বানিয়েছি নিজের জন্য। তুমি আমার হয়ে দেখাও। যদি কোনো মা-বাবার সন্তান নাফরমান হয় তাহলে মা-বাবা কাঁদে। হায় আজ আমার সন্তান আমার কথা শুনে না। অবাধ্য হয়ে গেছে। অথচ তাকে কত কষ্ট করে, কত আদর যত্ন করে লালন পালন করেছি।

আর যে আল্লাহ এক ফোঁটা নাপাক পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহর তো তার বান্দার প্রতি মা-বাবার চাইতে বেশি ভালোবাসা অনুগ্রহ থাকার কথা। সন্তান অবাধ্য হলে মা-বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ কি কোনো দিন কোনো মানুষকে দুনিয়া থেকে বের করে দিয়েছেন তাঁর অবাধ্য হওয়ার কারণে? যে, সে আমার অবাধ্য, তার খানা দানা বন্ধ। তার চোখ তুলে ফেলো, সে সিনেমা দেখে। তার কান বন্ধ করে দাও, সে গান শুনে। না, আল্লাহ তা'আলাা কখনও এমন করেন না।

মানুষ নিজেকে কত রঙে কত রকমে সাজিয়ে ভালো ভালো পোষাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ডানে বামে সামনে পিছে ঘুরিয়ে দেখে। পোষাকটা ঠিক আছে কিনা, জুতার কালার ঠিক আছে কিনা, চুল

ঠিকমত আচড়ানো হয়েছে কিনা? সব কিছু শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য। মানুষের মন জয় করার জন্য।

আল্লাহ বলেন, হে বান্দা! তুমি আমার হয়ে দেখাও না। যে মানুষকে আমি বানিয়েছি, তাদের জন্য তোমার এত সাজ-সজ্জা, আর আমি সৃষ্টিকর্তার জন্য তোমার সাধনা কতটুকু? এখানে আল্লাহর জন্য হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, অন্তরে শুধু আল্লাহর মুহব্বত রাখা। দেহকে মুহাম্মদ (সা)-এর সুন্নত মতো সাজানো। সবকিছু রাসূলের সুন্নত মত হওয়া।

আমার চেয়ে ভালোবাসা দেওয়ার মতো কেউ কি আছে?

আল্লাহ পাক আবার বলছেন, আমার বান্দা! তোমরা আমার হয়ে যাও। আল্লাহর এতবড় বাদশাহী, আমরা তার বান্দা, আর সেই আল্লাহ আমাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইছেন।

يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنِّىْ لَكَ مُحِبٌّ হে বনি আদম! আমি তোমাদের মহব্বত করি।

فَبِحَقِّىْ عَلَيْكَ كُنْ لِّىْ مُحِبًّا তোমাদের আমার কসম, তোমরা আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো।

يا ابن ادم اذكرك وتنسانى আমি তোমাদের স্মরণ রাখি, আর তোমরা আমাকে ভুলে যাও!

وَاَسْتُرُكَ وَلَاتَخْشَانِىْ আমি তোমাদের গোনাহগুলোকে লুকিয়ে রাখি এরপরও তোমরা পাপ করতে লজ্জ করো না। দেখুন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কত দয়াশীল। তার পাবন্দি আনুগত্য তার মুহব্বত ছাড়া অর্জন করা যায় না।

مَنْ اَعْظَمُ مِنِّىْ جُوْدًا وَّكَرَمًا يُبَارِزُوْنِىْ بِالْعَزَائِمِ اكلهمْ فِى الْمَرَاجِعِ كَاَنَّهٗ لَمْ يَعْصَنِىْ۔

আমার চেয়ে বড় দাতা আর কে আছে? বান্দা পাপ করতে করতে আমার জমিনকে ভরে দেয়। তার পাপে দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত আগুন জ্বলে যায়। আর সেই পাপী বান্দা যখন রাতে ঘরে এসে শোয়, তখন আমি তার চোখে শান্তির ঘুম দান করি। অথচ সে সারা দিন আমার অবাধ্য ছিলো।

আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ اَعْرَضَ مِنِّىْ نَادَيْتُهُ عَنْ قَرِيْبٍ

আর যে আমার নাফরমানীতে সর্বক্ষণ লেগে আছে, আমি তার খুব কাছে গিয়ে ডাকি। (সূরা ত্বহা : ১২৪)

যেমন মা তার বাচ্চাকে ডাকে, এদিকে এসো, কোথায় যাচ্ছো? ভুল পথ ছেড়ে দাও। এর জন্য প্রথম কাজ হলো তওবা। আল্লাহ তো চান, বান্দা তাঁর দিকে ফিরে আসুক। আমাদের অন্তরে আল্লাহর মুহব্বত পরিপূর্ণভাবে কায়েম হোক, আল্লাহ এই কামনা করেন বান্দার প্রতি।

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

আপনি বলুন আমার বাঁচা, মরা, আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার সব কিছু শুধু আল্লাহর জন্য ।

দেখুন! আল্লাহ তা'আলা বন্দেগীতে কোনো শরীক সহ্য করেন না, তার মুহব্বতের মধ্যেও কোনো অংশীদারীত্ব সহ্য করেন না। আরে মানুষও তো তাঁর ভালোবাসার মধ্যে কাউকে অংশীদার হিসেবে বরদাশত করে না। মহিলারা যদি জানে যে তার স্বামী অন্য মহিলার সাথে সম্পর্ক রাখে বা আরেকটি বিবাহ করেছে, তাহলে সে মহিলার অন্তর কষ্টের আগুনে জ্বলে যায়। রাগে দুঃখে কত কাণ্ড করে ফেলে। আর আল্লাহ তা'আলা অনেক মুহব্বত করে অনেক ভালোবেসে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি এক অদ্বিতীয়। আল্লাহর কোনো শরীক নেই। আমাদের অন্তর জুড়ে শুধুতো আল্লাহরই অস্তিত্ব থাকতে হবে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যইতো আমাদের কাজ। এটাইতো কৃতজ্ঞতা। আজ আমরা যদি আল্লাহর গোলামী বাদ দিয়ে আল্লাহর মুহব্বতকে অন্তরে স্থান না দেই, তাহলে তিনি তা বরদাশ্‌ত করবেন কেনো?

সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত কথাতো হলো, আমরা মানুষেরা সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী। মানুষের চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী আর কোনো সৃষ্টি নেই। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, এ জগতে জলে স্থলে, আসমানে জমিনে, উত্তরে দক্ষিণে, পুর্বে পশ্চিমে তিনিই একমাত্র অমুখাপেক্ষী সত্ত্বা। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। এ জগতে সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী আমরা মানুষ। আমাদের প্রয়োজনও সবচেয়ে বেশি।

তাই এমতাবস্থায় এটাইতো স্বাভাবিক ছিলো যে সবচেয়ে বেশি আমরা আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব রাখবো। অথচ আমরা শত্রুতায় প্রতিনিয়ত ব্যস্ত। আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করছি। তাঁর অবাধ্য হচ্ছি। বড় বড় গোনাহ করেও তাঁর ভয় অন্তরে আসছেনা। আল্লাহর আদেশ নামাজ পড়ো। আমরা ক'জনইবা নামাজ পড়ি, আমরা ক'জনইবা যাকাত দেই। মা বোনেরা কজনইবা পর্দা করে চলেন?

একটি উদাহরণ দিচ্ছি, আপনি বেতন দিয়ে চাকর রাখলেন, চুক্তি মতো সে আপনার কাজ করবে। যদি সে কাজে ফাঁকি দেয়, কাজ ঠিক মতো না করে, কথা শোনে না। তবে কি আপনি তাকে চাকুরিতে বহাল রাখবেন? রাখবেন না। বলবেন যে তোমার মতো অবাধ্য চাকরের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলাার আদেশ আমরা কত সহজে অমান্য করছি। কারও বয়স চল্লিশ কারও বা বিশ, কারও বা ত্রিশ, কারও বা ষাট সত্তর, আশি। এর মধ্যে কতবার আল্লাহর অবাধ্য হয়েছি তার কি কোনো হিসাব আছে? কিন্তু এর পরও কি আল্লাহ এমন কোনো বান্দাকে চাকুরিচ্যুত করেছেন?

কারও চোখ তুলে নিয়েছেন?

কারও হাত ভেঙ্গে দিয়েছেন?

কারও পা দু'টি নষ্ট করে দিয়েছেন?

কানে শিশা ঢেলে দিয়েছেন?

না তিনি এমনটি করেননি। তিনি কত বড় মহৎ হৃদয়ের যে আমরা প্রতিনিয়ত তার আদেশ অমান্য করছি, এরপরও তিনি আমাকে খাবার দিচ্ছেন। আমাকে পান করাচ্ছেন। নিদ্রা দিচ্ছেন। ছায়া দিচ্ছেন। ছাদ, ছায়া, ফল ফুল। সকালের নির্মল হাওয়া দিচ্ছেন। ঠান্ডা-গরম, দিচ্ছেন, আলো দিচ্ছেন।

তিনি কত বড় দয়াবান, এত নাফরমানী, এতো অবাধ্যতা দেখেও তিনি আমাকে সবই দান করছেন।

আমরা শতভাগ আল্লাহ তা'আলাার করুণার মুখাপেক্ষী। জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কাছে আমাদের প্রয়োজন অসংখ্য, অসীম।

আজ আল্লাহ যদি তাঁর সুন্দর ব্যবস্থাপনাকে সামান্যতম এদিক সেদিক করে দেন, তাহলে আমাদের কিছুই করার থাকবে না। মানুষ তাঁর দয়া ও অনুকম্পার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

আমার সব কিছুতো আল্লাহর জন্য হওয়া চাই

প্রিয় বোনেরা!

আমাদের অন্তর তো সর্বক্ষণ আল্লাহর ভালোবাসায় ভরপুর থাকতে হবে। অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে। আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানার মধ্যেইতো আমাদের কামিয়াবী। আমার বাঁচা, আমার মৃত্যু, আমার জীবন আমার সম্পদ আমার সব কিছুতো আল্লাহর জন্য। আমরা যদি আল্লাহর বান্দা হয়ে যাই, আল্লাহর গোলাম হয়ে যাই, তাহলে তিনিও আমাদের হয়ে যাবেন। দেখুন! আল্লাহকে মানাইতো হলো প্রকৃত জীবন। তাঁকে হাসিল করাইতো প্রকৃত সফলতা। তা না হলে আমরা যত বড় কিছুই হইনা কেন, তাতে কোনো সুখ নেই। শান্তি নেই। দেখুন, আল্লাহর গোলামী না করলে আমরাতো অকৃতজ্ঞ হয়ে মারা যাবো। আল্লাহর দয়া কত বিশাল। আল্লাহর করুণার কোনো সীমা নেই।

আমরা গোনাহ করি। তিনি ক্ষমা করতে থাকেন। আমাদের অবাধ্যতা, নাফরমানী বৃদ্ধি পায়, তিনি তা এড়িয়ে যান। আমাদের বেহায়াপনা নির্লজ্জতায়ও তিনি নিশ্চুপ। আবার গোনাহ করি, তিনি তা গোপন করেন। আমাদের গোনাহ কাউকে জানতে দেন না। তিনি চান বান্দা তার আবার সঠিক পথে ফিরে আসুক। বান্দার সাথে আল্লাহর কি মধুর সম্পর্ক।

কিয়ামতের দিন আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের হিসাবের দায়িত্ব যদি আমার উপর ছেড়ে দিতেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, হে আমার হাবীব! কেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের কত গোনাহ, সেগুলো সবার সামনে প্রকাশ পেলে আমার উম্মতরা লজ্জা পাবে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলবেন, হে আমার দোস্ত! আপনি যখন হিসাব নিবেন, তখনও তো আপনার উম্মতগণ লজ্জিত হবে। নাকি হবে না? তার চেয়ে ভালো, আমিই হিসাবটা খুব

গোপনে সেরে ফেলি। আমি আল্লাহই তো বান্দার অভিভাবক। তারা আমারই সৃষ্টি। আমিই হিসাবটা শেষ করে বান্দাকে মুক্তি দেই।

দেখুন। বান্দার প্রতি আল্লাহর কত ভালোবাসা। আরে আল্লাহর বান্দি! দুনিয়াতে কত ভালোবাসাইতো শিখলা। স্নো-পাউডার মেখে বে-পর্দা হয়ে কত পুরুষের নজর কাড়লা। আমার আল্লাহর সাথে মুহব্বত করতে শেখো।

হে মুসলিম নারী! হুঁশে আসো

আরে! এ-অন্তর যেটা আল্লাহর মুহব্বত থেকে খালি। যে অন্তর পাপের কারখানা। অন্তর এমন হয়ে গেছে যে গোনাহ করতে ভয়তো লাগেই না আরও মজা অনুভব হয়। আনন্দ লাগে। এই চোখ এমন নির্লজ্জ হয়ে গেছে যে, তার রূপ যৌবন মানুষের সামনে ফেরী করতেও আনন্দ লাগে। হাটে, ঘাটে, মাঠে সর্বত্র অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার ছড়াছড়ি। এই কান যা গান শুনতে শুনতে অভ্যাস হয়ে গেছে। মুয়াজ্জিনের আযান কানে প্রবেশ করেনা। গোনাহ করতে করতে এমন হয়েছে যে তার সমস্ত শরীর পাপের সাগরে নিমজ্জিত। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

আমাদের হুঁশ হয় না। আরে আল্লাহর সামনে তো আমাদের উপস্থিত হতে হবে। একটু ভাবুন। তখন কেমন হবে। এত গোনাহ নিয়ে তার সামনে কেমনে দাঁড়াবো? পায়ের পাতা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত গোনাহে ভরপুর। সমস্ত শরীর আজ পাপে পরিপূর্ণ। এ মুখ কত মিথ্যা বলেছে। এই চোখ কত অশ্লীলতা দেখেছে। এ কানে কত মন্দ কথা শুনেছে। এ হাত কত অন্যায় করেছে। এ পা দিয়ে হেটে কত মন্দ স্থানে গমন করেছে। এত পাপ নিয়ে কেমনে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো?

প্রিয় বোনেরা! একটু হুঁশে আসুন। আমাদের পাপ আর তার পরিনাম সম্পর্কে যদি চিন্তা করি, সামান্য সময়ও যদি চিন্তা করি। মদ খোরও তো একটা সময় হুঁশে আসে। আজ আমাদেরকে এ কেমন নেশায় পেয়ে বসেছে যে, বিশ, পচিশ, ত্রিশ, চল্লিশ বছর হয়ে গেলো বয়স, এখনো হুঁশ হলো না। এমন পাহাড় সমান গোনাহ নিয়ে আল্লাহর সামনে কেমনে যাবো। আল্লাহর আমাদের তওবার তৌফিক দিন। আমীন।

অন্তরতো অন্ধকার হয়ে গেছে

বোনেরা! আমাদের জিন্দেগীর উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলাকে রাজি ও খুশী করা। আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকাকে নিজের তরীকা বানানো। এটাইতো আমাদের জিন্দেগী। দুনিয়ার শান শাওকাত তো অনেক হলো। আল্লাহর দেওয়া চোখে কতো রঙীন স্বপ্ন দেখেছি। কত উন্নত জীবনের সন্ধানে হালাল হারামের তোয়াক্কা করিনি।

আমাদের অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। দুনিয়া থেকে আজ মানবতা হারিয়ে গেছে। মানুষ নামের সুরতটা শুধু দুনিয়াতে ঘুরছে। মানুষের স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষের দেহটা শুধু আছে। ঘরকে সুন্দর করে সাজাই। কিন্তু অন্তরতো কালো অন্ধকার হয়ে আছে। শহরগুলো সারা রাত বাতির আলোয় উজ্জল থাকে। রাস্তায় বাতি জ্বলে। ঘরবাড়ি আলোকিত। কিন্তু আমাদের অন্তরের রাজ্য, অন্তরের রাস্তাতো অন্ধকার শূন্য, সময়তো যাচ্ছে, অন্তরতো উজ্জল হচ্ছেনা। অন্তরের সব দিকে আঁধার।

আজ আমরা জমিনকে সবুজ ফসলের দ্বারা সাজাই। যেদিক চোখ যায় শুধু সবুজ ফসলের হাসি। কিন্তু আমার দিলতো খা খা মরুভূমি হয়ে আছে। আমরা অন্তরকে সজীব করতে পারিনি।

যে অন্তরে আল্লাহর মুহব্বত নেই। যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁদেনা। যে অন্তর শেষ রাতের আরামের ঘুম ফেলে জায়নামাজে দাঁড়ায় না। যে দিল আল্লাহকে সেজদা করেনা যে অন্তর চোখ থেকে পানি বের করতে পারে না, সেটাতো অন্তর নয়। পাথর, যা শক্ত হয়ে গেছে।

আজ স্ত্রী স্বামীর ভালোবাসার স্বাদ বুঝেছে। পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি ভালোবাসার মজা উপভোগ করেছে। আর আমরা সবাই টাকা, পয়সা-ধন-সম্পদের মজা অনুভব করছি। এতো কিছুর মজা, স্বাদ-ইন্টারেস্ট তো, বুঝলাম। কিন্তু মহান আল্লাহ পাকের ভালোবাসার মজাতো নিলাম না, বুঝলাম না।

আল্লাহর ভালোবাসায় আল্লাহর ভয়ে কাঁদা, আল্লাহর ভালোবাসায়, ভয়ে পেরেশান হওয়া। আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্য করা আজ

বান্দার অন্তর থেকে উঠে গেছে। এ উম্মত অন্ধ হয়ে গেছে। সবার অন্তরের ভেতর খা খা করছে। শূন্য, মরুভূমি।

আমাদের অন্তর আজ অন্ধকার।

চোখ উজ্জল, আলোকিত।

অন্তরের ভেতর কালিমালিপ্ত।

কিন্তু ঘর-দোর সাদা ঝকঝকে।

অথচ আম্বিয়া (আ.) গন নিজের জানমাল সব উজার করে দিয়ে মানুষের অন্তরে ঈমানের আলো ছড়িয়ে দিতেন। ঈমানের বাতি জালাতেন। উম্মতের অন্তরগুলোকে আল্লাহর মুহব্বত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামগণকে এমন ঈমান শিখালেন যে, সাহাবায়ে কেরামগণ সেজদায় পড়ে আল্লাহর মুহব্বতে, আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। জায়নামাজ ভিজে যেতো, জমিন ভিজে যেতো।

বোনেরা! আমাদের আগে ঈমান শিখতে হবে। তাহলে অন্তর ঈমানের নূরে পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন অন্তরে আল্লাহর ভয় এসে যাবে। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এসে যাবে। আল্লাহর ভয় যদি অন্তরে থাকে, আল্লাহর ভালোবাসা যদি অন্তরে পরিপূর্ণভাবে বসে যায়, তখন মহান রাব্বুল আলামীনও আমাদের প্রতি সদয় হবেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামগণকে নিয়ে এক জিহাদে রওয়ানা হলেন। অভাবের সময় ছিলো। খরায় সব পুড়ে গিয়েছিলো। খাদ্যের অভাব। পানির অভাব। তাই সৈন্যদের মাঝে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প অল্প করে পথ খরচ আর কিছু খাদ্য বিতরণ করলেন। এক সাহাবী ভূলে বাদ পড়ে গেলো। তাকে দিতে মনে ছিল না রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর। একথা সে রাসূল (সাঃ) কে বলেও নি, যে ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো বাদ পড়ে গেছি। আমাকেও কিছু দেন।

সে কিছু না বলে কাফেলার সাথে চলছে। যখন প্রচণ্ড ক্ষুধায় অস্থির হয়ে গেলেন, তখন বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তোমার হাবীব দেনি। ভুলে গেছেন। আমিও চাইনি। তুমি তো জানো আমার কাছে কোনো খাদ্য

দ্রব্য নেই। ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও। এই বলে পড়তে লাগলেন।

سُبْحٰنَ اللهِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ اَللهُ اَكْبَرُ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔

এটাই আমার খানা। এগুলোই আমার পথ খরচ। একথাগুলো বলছেন আর চলছেন। চলছেন, আর বলছেন।

যাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, তিনি আল্লাহতো সব কিছু দেখছেন, যে হুদাইর (রাযি.) কি বলছেন, হুদাইর (রাযি.)-এর একথাগুলো আল্লাহর আরশে পাকে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। জিবরাঈল (আ.) আসলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে। বলছেন জিবরাইল (আ.), হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হুদাইর (রাযি.) তো আল্লাহকে এমনভাবে ডাকছে যে, আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন এক সাহাবীকে, যাও হুদাইরকে ডাকো। এই নাও তাকে দিও। কিছু খানা তাকে দিয়ে বললেন, বলবে আমার মনে ছিলো না। এখন তোমাকে দিয়েছেন। সেই ছাহাবী হুদাইর (রাযি.) কে খুজে বের করলেন, বললেন, ভাই! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলে গিয়েছিলেন, এখন তোমাকে দিয়েছেন, হুদাইর (রাযি.) পুটুলিটা হাতে নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ذَكَرَنِىْ مِنْ فَوْقِ عَرْشٍ وَمِنْ فَوْقِ سَبْعَ سَمٰوٰةٍ۔

হে আল্লাহ! তোমার হাতে আমার জীবন। তুমি আরশে পাকে আমাকে মনে রেখেছো!

رَحِمْتَ بِىْ وَجُوْعِىْ তুমি আমার ক্ষুধার উপর দয়া করেছো, তুমি আমার দুর্বলতার উপর দয়া করেছো।

اَللّٰهُمَّ كَمَا لَمْ تَنْسَ هُدَيْرَ لِيَجْعَلَ هُدَيْرَ اَلَّا يَنْسَاكَ হে আমার মাওলা! যেমনভাবে তুমি আমি হুদাইরকে ভুলোনি, তুমিও হুদাইরকে তৌফিক দাও, সে যেনো তোমাকে না ভূলে। দেখুন! হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের নমুনা। আল্লাহকে তারা কিভাবে ডাকতেন।

চরিত্রবান হতে হবে

প্রিয় মা ও বোনেরা!

নামাজ পড়া সহজ, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া কঠিন। যিকির করা সহজ, উত্তম চরিত্র অর্জন কঠিন। চিল্লা লাগানো সহজ, কিন্তু চরিত্রবান হওয়া সহজ নয়। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, حُسْنُ الْخُلُقِ يُكَمِّلُ الْاِيْمَانَ উত্তম চরিত্র পুর্ণাঙ্গ ঈমান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে একজন গ্রাম্য লোক এলো। রাসূলের সামনে এসে জিজ্ঞেস করছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

مَا الدِّيْنُ দ্বীন কি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, حُسْنُ الْخُلُقِ উত্তম চরিত্র।

সে ব্যক্তি উঠে আবার বাম দিকে গেলো। জিজ্ঞেস করলো,

يَا رَسُوْلَ اللهِ-مَا الدِّيْنُ؟ হে আল্লাহর রাসূল! দ্বীন কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, حُسْنُ الْاَخْلَاقِ উত্তম চরিত্র,

এরপর সে লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে গেলো। বললো। ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مَا الدِّيْنُ দ্বীন কি? এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনের দিকে ঘুরে দেখলেন সেই লোকটি। বিরক্ত হলেন না। বললেন, ভাই তুমি কবে বুঝবে? উত্তম দ্বীন তো এটাই যে রাগ করবেনা।

وَهُوَ لَاتَغْضَبُ দ্বীন তো এটাই, যে রাগান্বিত হবে না। ক্রুদ্ধ হবে না। আরো বললেন, যার চরিত্র ভালো নয়। আচরণ ভালো নয়, তার সমস্ত নেক আমলগুলো অন্য জনে নিয়ে যায়। যার কথায় মাধুর্যতা নেই, যার কথা বার্তা ধারালো ছুরির মতো, তার মুখের মন্দ কথাগুলোর কারণে তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

এরপর আবার বললেন,

اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ নিজের জবানকে সংযত করো। যেনো কোনো মুসুলমানের বিরুদ্ধে তোমার জবানের ব্যবহার লাগামহীন না হয়। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন।

ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জবানের কটু কথার কারণেও কি আমাদের ধরা হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বহুলোক শুধু অসংযত জবানের কারণে, অর্থাৎ গীবত, পরনিন্দা, অশ্লীল কথা, ও মিথ্যা কথার জন্য জাহান্নামে যাবে।

একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়েছিলেন, এক সন্ত্রাসী খোলা তরবারী হাতে এসে বললো, আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ বাঁচাবেন। জিবরাাইল আমীন এলেন। সন্ত্রাসীর বুকে ধাক্কা দিলো। সেদূরে ছিটকে পড়েগেল। তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেলো। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারী তুলে নিলেন। বললেন, এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? সেতো আল্লাহকে চিনত না, মানতোনা। সন্ত্রাসী বললো, আমাকে আর কে বাঁচাতে পারে। তুমিইতো পারো আমাকে বাঁচাতে। তুমি আমাকে বাঁচাও।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চলে যাও। তুমি কি আমাকে নবী বলে স্বীকার করো না?

সে বললো না মানিনা। এরপর সে তার গোত্রের কাছে গিয়ে ঘটনা বললো। আবার ফিরে এলো রাসূলুল্লাহ (সা:) এর দরবারে। কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলো। এই ছিলো রাসূলুল্লাহরো মহান চরিত্র। যাঁর চরিত্রের মাধুর্যতায় পাথরকেও নরম করে দিতো। প্রিয় রাসূল (সা:) এর চরিত্র পাথরকেও নরম করে দিতো। তাই আমাদের রাসূল (সা:) এর চরিত্র শিখতে হবে।

এক লোক আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযী:) কে গালি দিলো। আবদুল্লাহ বিন জাফর (রাযী:) সেই লোকটির পেছনে পেছনে তার বাড়ি গেলেন। লোকটিকে বললেন, ভাই! তুমি আমাকে যা বলেছো তা যদি সত্য হয় তাহলেতো আমার জন্য সর্বনাশ। আর যদি তুমি ভূল বলে থাকো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। একথা শুনে লোকটি

ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জবানের কটু কথার কারণেও কি আমাদের ধরা হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বহুলোক শুধু অসংযত জবানের কারণে, অর্থাৎ গীবত, পরনিন্দা, অশ্লীল কথা, ও মিথ্যা কথার জন্য জাহান্নামে যাবে।

একদিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়েছিলেন, এক সন্ত্রাসী খোলা তরবারী হাতে এসে বললো, আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ বাঁচাবেন। জিবরাাইল আমীন এলেন। সন্ত্রাসীর বুকে ধাক্কা দিলো। সেদূরে ছিটকে পড়েগেল। তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেলো। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারী তুলে নিলেন। বললেন, এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? সেতো আল্লাহকে চিনত না, মানতোনা। সন্ত্রাসী বললো, আমাকে আর কে বাঁচাতে পারে। তুমিইতো পারো আমাকে বাঁচাতে। তুমি আমাকে বাঁচাও।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চলে যাও। তুমি কি আমাকে নবী বলে স্বীকার করো না?

সে বললো না মানিনা। এরপর সে তার গোত্রের কাছে গিয়ে ঘটনা বললো। আবার ফিরে এলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দরবারে। কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলো। এই ছিলো রাসূলুল্লাহরো মহান চরিত্র। যাঁর চরিত্রের মাধুর্যতায় পাথরকেও নরম করে দিতো। প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর চরিত্র পাথরকেও নরম করে দিতো। তাই আমাদের রাসূল (সাঃ) এর চরিত্র শিখতে হবে।

এক লোক আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযীঃ) কে গালি দিলো। আবদুল্লাহ বিন জাফর (রাযীঃ) সেই লোকটির পেছনে পেছনে তার বাড়ি গেলেন। লোকটিকে বললেন, ভাই! তুমি আমাকে যা বলেছো তা যদি সত্য হয় তাহলেতো আমার জন্য সর্বনাশ। আর যদি তুমি ভূল বলে থাকো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। একথা শুনে লোকটি

আবদুল্লাহ্ বিন জাফরের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, ভাই! আমি ভূল বলেছি। মিথ্যা বলেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। এটাইতো হলো চরিত্র। নবী চরিত্রের এটাইতো মহাত্ব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর দরবারে এক সাহাবী এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার প্রতিবেশী এক মহিলা আছে, যে দিনে রোজা রাখে। আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে। কিন্তু তার কারণে তার ব্যবহারে অন্য প্রতিবেশীরা কষ্ট পায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মহিলার জন্য কোনো সু সংবাদ নেই। সে জাহান্নামী।

এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি চাই আমার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার চরিত্র সুন্দর কারো, তোমার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে।

এক ব্যক্তি ইমাম যাইনুল আবেদীন (রহ.) কে গালী-গালাজ করতে লাগলো। ইমাম যাইনুল আবেদীন (রহ.) লোকটির দিক থেকে চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি ভাবল, হয়তো সে শুনতে পায়নি যে তাকে গালি দিয়েছি। লোকটি ইমামের সামনে গিয়ে বললো, আপনাকে আমি গালি দিয়েছি আপনি শুনতে পাননি?

ইমাম যাইনুল আবেদনী (রহ.) বললেন, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।

এক তাবেঈর চরিত্রের দৃঢ়তা

হাবীব ইবনে ওমায়ের (রহ.) একজন তাবেঈ। সাহাবাদের শিষ্য। সুদর্শন, সুপুরুষ। শত্রুপক্ষের দশজনকে হত্যা করে ধরা পড়লেন। রোমান নেতা বললো, একে আমি গোলাম বানাবো। হাবিব ইবনে ওমায়ের কারাগারে বন্দি। রোমান নেতা একদিন বললো, তোমাকে আমি মুক্তি দেবো, যদি তুমি খৃস্টানে হয়ে যাও। আর আমার মেয়েকে তোমার হতে তুলে দেবো। আমার রাজ্যের কিছু অংশও তোমাকে দান করবো।

হাবীব ইবনে ওমায়ের বললেন, যদি সমগ্র জগতটাও দিয়ে দাও তবুও আমার অন্তর থেকে ঈমান ছিনিয়ে নিতে পারবেনা। তোমরা কাফেররা

নির্লজ্জ, বেহায়া। আর আমার ধর্ম ইসলামে হায়া-লজ্জা ও শালীনতা সবটুকুই আছে।

রোমান নেতা মেয়েকে বললো। এর দ্বারা তোমার সাথে অপকর্ম করাও, তাহলে ইসলাম ছেড়ে দেবে।

রোমান নেতার রূপসি কন্যা একদিন তাবেঈ হাবিব ইবনে ওমায়েরের কাছে এলো। মেয়েটির রূপ যৌবন ছিল অপূর্ব। গায়ে তার খোলামেলা পোষাক। আর হাবীব ইবনে উমায়ের টগবগে যুবক। সেই কক্ষে শুধুই দু'জন। তৃতীয় কেউ নেই। এ মুহূর্তে এখানে সব ধরনের বাধা বিপত্তি অনুপস্থিত। রোমান নেতার মেয়ে যুবককে যিনার জন্য আহবান জানাচ্ছে আর যুবক দৃষ্টিকে অবনত করে দাড়িয়ে আছে। চরিত্রের পবিত্রতার স্বাদ তাঁর জানা আছে। তাই মেয়েটির দিকে চোখ তুলে তাকানোর নামও নিচ্ছেনা।

মেয়েটি তার সব কৌশল প্রয়োগ করলো। রূপ ও যৌবনের সব তীর পরীক্ষা করলো। কিন্তু তার চরিত্রের দৃঢ়তার তরবারী প্রতিটা আক্রমণকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলো, প্রতিটা তীরকে ব্যর্থ করে দিলো।

এভাবে কয়েক দিন মেয়েটা যুবককে অপকর্মে লিপ্ত করার সব চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হলো, তখন মেয়েটি হাবীব ইবনে ওমায়েরকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, বলোতো তোমাকে কোনো শক্তি আমার রূপ যৌবনের আকর্ষণ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে? আজ তিনটি দিন আমি এমন নজরকাড়া রূপের বাহার নিয়ে তোমার সামনে এসেছি, অথচ একটি বারও আমার দিকে চোখ তুলে তাকালে না! কিসে তোমার চরিত্রকে এমন দৃঢ় করেছে?

হাবীব (রহ.) বললেন, আমাকে মহান আল্লাহর ভয় ঠেকিয়ে রেখেছে। لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ যাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করেনা। নিদ্রা ও না। যিনি আমার থেকে উদাসীন নন। আমি তাঁর থেকে উদাসীন। তিনি আমার রব। আরশের উপর বসে আমাকে দেখছেন যে, আমার ভালোবাসা জয়ী হয়, না বান্দার যৌবনকামনা। আমাকে সামনে রাখে, না শয়তানকে সামনে রাখে। হে মেয়ে শোন! আজ আমি এই নির্জনে তোমার সাথে অপকর্ম করতে পারতাম, যদি জানতাম কেউ দেখছেনা। আমার রব তো সব দেখেন। কিছুই তার কাছে গোপন নেই। আমার রবকে আমি লজ্জা করি। তাই আমি আমার স্পৃহাকে দমিয়ে রেখেছি।

মেয়েটি কক্ষ থেকে বের হয়ে পিতাকে বললো, আমাকে কার কাছে পাঠালেন? কোনো লোহার কাছে? না পাথরের কাছে? সে খায়ও না, তাকায়ও না। আমি কিভাবে তাকে ঘায়েল করবো?

একবার এক বুযুর্গ স্বপ্নে শয়তানকে দেখলেন, শয়তান বললো; কখনও যেনো একজন বেগানা নারী আর একজন পুরুষ নির্জনে একত্রিত না হয়।

যদিও সে মহিলা রাবেয়া বসরির মতো নেককার হয়। আর পুরুষ যদি হাসান বসরির মতো নেককার ও হয়। যদি একত্র হয়ে যায়, তাহলে তাদের পথ ভ্রষ্ট করতে তৃতীয়জন আমি হাজির হয়ে যাই।

অপরকে ছোট না করি।

প্রিয় বোনেরা!

নিজেকে বড় না মনে করি। অপরকে ছোট না করি। একে অন্যকে কটাক্ষ করে কথা বলে লজ্জায় না ফেলি। কোনোভাবেই যেন অন্য মুসলমানের গীবত না করি। আমাদের একটা দোষ, আমরা অন্যের দোষকে বড় করে দেখি। কার কি গোপন দোষ আছে তা তালাশ করি। এটা ভালো নয়, এটা বড় গোনাহের কাজ। আমার নিজের কি ভুল ভ্রান্তি আছে তা আগে খুজে বের করে সংশোধন হই। নিজে চিন্তাভাবনা করি, আরে আমারতো কত দোষ আছে। তাহলে আমি কেনো অন্যের দোষ খুজে বেড়াই।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন, সেভাবে চলতে হবে। নিজেকে যদি মুক্ত স্বাধীন মনে করে বিধর্মীদের মতো চলা ফেরা করি, তাহলে তো আমার জন্য বরবাদী অপেক্ষা করছে। এ মুক্ত মানষিকতাই আজ মুসলমানদের সর্বনাশ করে দিলো। ঈমান কেড়ে নিচ্ছে। আমানতদারী নেই। স্বামী স্ত্রীর হক আদায় করছেনা। স্ত্রী স্বামীর আমানতকে পরপুরুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আরে বোন! আল্লাহর নাফরমানী করে আল্লাহর রহমত আশা করি কিভাবে। যদি আল্লাহর পথে চলতাম। আল্লাহর আদেশ নিষেধকে মেনে চলতাম, তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাতেন। আল্লাহর রাসূল (সা:) এর আদর্শকে জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামত মনে করে অনুসরন করতে হবে। আজ মানুষ দুনিয়ার সম্পদ, দুনিয়ার সৌন্দর্য, দুনিয়ার বিলাসিতায় এতটাই 'মশগুল যে, রাসূল (সা:) এর আদর্শ ভুলে গেছে।'

অথচ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত শ্রম দিয়ে শরীর মুবারকের পবিত্র রক্ত ঝরিয়ে ইসলামকে আমাদের জন্য নাজাতের রাস্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনিতো কোনো দিন আল্লাহর কাছে দুনিয়ার সুখ শান্তি আরাম আয়েশ কামনা করেননি। যদি এসব চাইতেন, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় দোস্তকে সবই দিতেন। কিন্তু রাসূল (সা:) তা কামনা করেননি। তিনি কামনা করেছেন উম্মতের নাজাতের পথ। উম্মতের মুক্তির চিন্তায় তিনি অস্থির ছিলেন। তিনি চেয়েছেন, আমরা উম্মতগণ যেনো মুসলমান হয়ে যাই। ঈমান শিখি।

একদিন আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক খেজুর বাগানে তাশরীফ নিলেন, বিশ্রামের জন্য। সাথে আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযি.) ও ছিলেন। যে খেজুরগুলো গাছ থেকে নিচে পড়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে একটি খেজুর তুলে পরিষ্কার করে মুখে দিলেন। আর আবদুল্লাহ বিন ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি খাচ্ছনা কেনো? হযরত ইবনে উমর (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার ক্ষুধা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো ক্ষর্ধাত।

هٰذِهِ الصُّبْحُ رَابِعَةٌ مَا ذُقْتُ شَيْئًا আজ চতুর্থ দিন হলো, আমি এক লোকমাও কিছু খাইনি।

দেখুন! আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার্ত। চারদিন ধরে। অথচ আল্লাহর কাছে আল্লাহর হাবীবের চেয়ে প্রিয় আর কেউ কি থাকতে পারে? সবচেয়ে প্রিয় তো তাঁর হাবীব। আল্লাহ তার বান্দাকে মা থেকে সত্তুর গুণ বেশি ভালোবাসেন। তাহলে নিজের দোস্তকে তিনি কেমন ভালো বাসেন?

সেই আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন চারদিন ধরে ক্ষুধার্ত। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ বিন ওমরকে বলেন, যদি আমি আল্লাহর কাছে চাই, তাহলে দুনিয়ার সব সম্পদ আমার হয়ে যাবে। আল্লাহ দিয়ে দেবেন। যদি আমি চাই, তাহলে আল্লাহ তা'আলাা আমার পায়ে রোম ও পারস্যের সমস্ত সম্পদ স্তুপ করে দেবেন। কিন্তু এরপরও আমি চাইনি।

হে আবদুল্লাহ! এমন এক জামানা আসবে যে, মানুষের ঘরে কয়েক বছরের খাদ্য মওজুদ থাকবে। এর পরও সে বলতে থাকবে তার সম্পদ

কিভাবে বৃদ্ধি পাবে। কিভাবে আরও হবে। আমারতো সম্পদ কম হয়ে গেলো। এমন লোকের ঈমান ইয়াক্বীন বরবাদ হয়ে যাবে। দেখুন! আজ আমাদের অবস্থাতো এ হাদীসের মতোই। আজ আমরা সম্পদ কামাই করার জন্য ঈমান ইয়াক্বীন বিনাশ করে দিচ্ছি। আমানতের খেয়ানত করছি। দুনিয়ার মায়ায় পড়ে মহান সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হচ্ছি। অথচ এ দুনিয়া একটি ধোঁকা প্রতারনা।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার মূল্য সম্পর্কে বলেছেন,

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

পার্থির জীবন প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। (সুরা হাদীদ, ২০)

আজ এই বাড়ি গাড়ি, সুন্দর পোষাক, অলংকার সবতো এক ধোঁকা। আমরা এগুলো কামাই করতে কত শ্রম দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন সব ধোঁকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ধোঁকার ঘর। দুনিয়া মাছির ডানা। আল্লাহ এ দুনিয়ার তিনটি নাম দিয়েছেন। (১) ধোঁকার ঘর। (২) মাছির ডানা। (৩) মাকড়শার জাল।

যদি কেউ মাছির ডানা দিয়ে বস্তা ভরে ফেলে তাহলে আপনি তাকে দেখে বলবেন, সে বস্তা ভরে মাল নিয়ে যাচ্ছে? নাকি বলবেন, দেখো সে পাগল হয়ে গেছে, বস্তা ভরে মাছির ডানা নিয়ে যাচ্ছে।

তাহলে দেখুন! আল্লাহ আমাদের ঈমান দিয়েছেন, আল্লাহর রহমতের এত বড় অনুগ্রহ আমাদের উপর বর্ষণ করেছেন, যে আল্লাহ আমাদের মুসলমান হিসেবে কবুল করেছেন। সারা পৃথিবীর কাফেররা মুসলমানদের কারণে বেঁচে আছে। সারা পৃথিবীর হিন্দু খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, মুসলমানের কারণে বেঁচে আছে। মুসলমান যদি না থাকত, আল্লাহ দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিতেন। যদি মুসলমান না থাকত, তাহলে জমিন ও আসমানের চিত্র উলট পালট হয়ে যেতো।

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَالُ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ. اَللّٰهُ اَللّٰهُ

যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে একজন আল্লাহ আল্লাহ বলার মতো লোক অবশিষ্ট থাকবে, কেয়ামত হবে না।

দেখুন যতক্ষণ পর্যন্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলার মতো একজন মুসলমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থাকবে। দুনিয়াতে

সুর্য উঠবে। চাঁদ জ্যোস্না ছড়াবে, বাতাস প্রবাহিত হবে। বৃষ্টি হবে। জমিন ফসল দেবে। ঋতু বদল হবে।

ফেরেশতাগণ আসা যাওয়া করবেন, সবকিছু তার নিয়ম মতো চলতে থাকবে। কিছুই বন্ধ হবেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ মুসলমান কালেমাওয়ালা বেচে থাকবে। যখন সে মরে যাবে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ দুনিয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন।

দেখুন মুসলমানের কত মূল্য। আমরা আমাদের মূল্য বুঝতে চেষ্টা করি। হীনমন্যতায় না ভূগি। নিজেকে এমন না ভাবি, আমরা মুসলমানরা কেন দুর্দশার শিকার?। না এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। অষ্ট্রেলিয়া ওয়ালারা আমাদের উছিলায় রিযিক পাচ্ছে। আমরা তাদের উছিলায় রিযিক পাচ্ছিনা। আমারিকা ইউরোপ সাত মহাদেশের পিপিলিকা পর্যন্ত মুসলমানদের বরকতে রিযিক পাচ্ছে। শয়তানের খানাও মুসলমানদের উসিলায় হচ্ছে।

যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত দুনিয়া থেকে মিটে যাবে তখন আল্লাহ তা'আলা৷ দুনিয়াকে ধ্বংস করে দেবেন।

আল্লাহ তা'আলার কারও সাথে আত্মীয়তা নেই এবং আল্লাহ - তা'আলা৷ আমাদেরকে দুনিয়ার এ প্রাচুর্যগুলো চাওয়া ব্যতীত দিয়েছেন। তাই আমরা মুসলমানরা সবচেয়ে গরীব মুসলমানও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের চেয়ে ভাগ্যবান। কেননা সে আল্লাহকে চিনেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেও চিনেছে। মুসলমানদের মধ্যে যে লোকটি সব চেয়ে মুর্খ, সেও বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের চেয়ে বড় বুদ্ধিমান। কেননা সে মুসলমান মুর্খ হলেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনেছে। আর আইনষ্টাইন এত বড় বিজ্ঞানী হয়েও এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। সে না আল্লাহকে চিনলো না রাসূলকে।

সমস্ত অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীদের চেয়ে আমাদের মুসলমান ঠেলাওয়ালা বেশি বুদ্ধিমান। সে আখেরাতকে জানে, মানে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান এনেছে।

প্রিয় বোনেরা!

মহান আল্লাহ তা'আলা৷ আমাদের পথ বলে দিয়েছেন, বলেছেন, যে আমাকে মানবে এবং হাবীবের দেখানো পথে চলবে, সে দুনিয়ার সবচেয়ে

সফল মানুষ। আর যে আমার রাস্তা বাদ দিয়ে চলবে এবং আমার হাবীবের তরীকা বাদ দিয়ে চলবে সে দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যর্থ মানুষ।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُّحَادِّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذَالِكَ الْخِزْىُ الْعَظِيْمُ-

যে আমার এবং আমার রাসূলের দুশমন হবে সে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে। এটাই বড় লাঞ্ছনা। (সুরা তাওবা, ৬৩)

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়াইতো সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। আমরা তো মনে করি যে গরীব হলাম তো সব শেষ হয়ে গেলো। না, আল্লাহ বলেন, যে আমার ও আমার রাসূলের অবাধ্য হলো সে ফকীর। সে ব্যর্থ। অকর্মা।

প্রিয় বোনেরা!

আমার কথা হলো, যেটা বলতে চাই যে, মুসলমান হয়ে বেঁচে থাকা অনেক বড় নেয়ামত। এর চেয়ে বড় সম্পদ আর নেই। আমার ঈমানের মূল্য ডলারের চেয়ে চেয়ে বেশি। পাউন্ডের চেয়ে বেশি। গাড়ি বাড়ি সব কিছুর বেশি।

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের কে ঈমানের নূর দিয়েছেন। মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন।

আমি এটা বলছিনা যে, দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। বরং আমি আপনাদের বলছি যে, এটা কেমন অকৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের? আমরা শুধু দুনিয়ার সম্পদ আরাম-আয়েশ আর নিজেকে সাজাতেই ব্যাস্ত। আমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত তরীকার কোনো পরওয়া করছিনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শকে অনুসরণ তো করছিইনা। আরও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করে এড়িয়ে যাই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারী পর্দায় থাকবে, শালীনতা মেনে পর্দা করে বের হবে। অথচ আজ কত বাহানায় তা মা ও বোনেরা অমান্য করছে। একবার কি চিন্তা করেছি এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা:) এর কত বড় অবাধ্যতা?

হে মুসলমান! অবুঝ হয়ো না, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রবল পরাক্রমশালী। আল্লাহর কসম, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অবাধ্য হয়ে তোমরা যত কিছুই হওনা কেন; আমেরিকা, রাশিয়ার চেয়ে বড় এটম বোমাও যদি তৈরি করো, তাহলেও তোমার ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাফরমানী করে সফল হতে পারবেনা।

তাই আসুন! আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা আল্লাহকে আপন বানাই। আমরা আল্লাহর হয়ে যাই। আল্লাহকে ছাড়া আমাদের সফলতা অর্জন হবে না। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ অনুসরণ অনুকরণই আমাদের সবচেয়ে সফলতা। আল্লাহ তা'আলার কাছে আরবী অনারবী নেই। আল্লাহর কাছেকে কোরাইশী কে পাঠান, কে খান সে বিষয় বিবেচ্য নয়। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হলো কে মুহাম্মদী উম্মত। আমাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাটি উম্মত হতে হবে। ভিতরে, বাহিরে, সর্বাবস্থায় মুহাম্মদী হতে হবে।

আজ আমাদের কত বদ কিসমত যে বিষয়গুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেন, সেগুলো আমরা অপছন্দ করার মতো দুঃসাহস দেখাচ্ছি।

দেখুন! যদি পাকিস্তানী কোনো সেনা অফিসার, যে ত্রিশ বছর যাবত সেনাবাহিনীতে আছে, বিশ্বস্ত। কিন্তু হঠাৎ একদিন ভারতের সেনাবাহিনীর পোষাক পরে ক্যাম্পে আসে, তাহলে তার কোর্ট মার্শাল হবে। তার বিচার হবে। সে যদি বলে ভাই, আমাকে শাস্তি দিচ্ছো কেন? আমি ত্রিশ বছর যাবত পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে বিশ্বস্ততার সাথে আছি। তাকে বলা হবে, তোমার গায়ে যে পোষাক তাতো দুশমনদের পোষাক। তুমি এই পোষাক পরার কারণে সন্দেহ ভাজন। কারণ হলো, তার প্রকাশ্য আচরণ দুশমনের সাথে মিলে গেছে। দেখুন! কাপড়ের কারণে সে অভিযুক্ত।

কেনো? নাপাকতো নয়। তাহলে অভিযুক্ত কেনো?

এজন্য যে, সে শত্রুদের পোষাক পরার কারণে সে অভিযুক্ত। এ পোষাক পরা তার জন্য অবৈধ। তার দেশের আইন অনুযায়ী এ পোষাক পরা অন্যায়।

তেমনিভাবে মুসলমানদেরও পোষাকের ব্যাপারে একটা নিয়ম আছে। সে পোষাক আমার দেহকে ডেকে দিবে। আমাকে শালীন দেখাবে। আপনি নারী, আপনার পোষাক এমন হবে, যাতে পর পুরুষ আপনাকে না দেখে। আপনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়। পর্দা মেনে চলা-ফেরা করতে হবে। পর্দা করা ফরয। আল্লাহর আদেশ, মানা বাধ্যতামূলক। না মানলে গোনাহ হবে। মানার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। নিজ কন্যাদের ইসলামীভাবে গড়তে হবে। ছোট বেলা থেকেই শরয়ী পর্দার ব্যাপারে অভ্যাস করাতে হবে। আমরা মুসলমান। আপনারা মুসলমান নারী। আপনাদের মতো নারীই তো জন্ম দিয়েছে কত অলি, গাউস, কুতুব। আপনারা ধর্মহীনতার পথে কেনো যাবেন? ইহুদী খৃষ্টানদের অনুসরণ অনুকরণ কেনো করবেন? আপনারা মুহাম্মদী উম্মত। উম্মতের মা। আপনাদের চোখ থাকবে পবিত্র। আপনাদের জবানে থাকবে কোরআনের তেলাওয়াত, জিকির। মেহদী রাঙা হাত স্মামী ছাড়া অন্যকে কেন স্পর্শ করতে দেবেন? আপনার সৌন্দর্য তো আপনার স্বামীর জন্য। রাস্তায়, হাটে, ঘাটে, মাঠে সে রূপ ফেরী করে কেনো নিজেকে জাহান্নামী করছেন?

প্রিয় বোনেরা! আসুন আমরা তওবা করি। আমাদের গায়ে যেনো ঈমানের নুর খেলা করে। আমাদের অন্তর যেনো ঈমানের নুরে আলোকিত হয়। আমরা জীবনভর শুধু কাঁটাই সংগ্রহ করেছি। যে পরিবেশে আমরা বড় হয়েছি তাতো এমনই গান্ধা। নাপাক সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হিংসা, প্রতারণা আর অশ্লীলতার বন্যা। তাই বেহায়াপনা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।

তাই আসুন! সমাজে ইসলামী আদর্শের ফুল ফোটাই। কাঁটা আর কত কুড়াবো।

আমাদের আঁচল আজ কাঁটায় ভরা।

হাত পা ক্ষত বিক্ষত।

সমাজ, পরিবেশ ক্ষত বিক্ষত। বিগত অন্ধকার দিনগুলোতে আমরা এমন ফসল বুনেছি যে, কাটা ছাড়া আর কিছুই তুলতে পারছি না।

তাই আসুন! আমরা তওবা করি।

আমরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর জীবনদর্শকে নিজেদের অলংকার বানিয়ে নেই।

নিজেদের পাপী চোখগুলোতে লজ্জাশীলতার কাজল মাখিয়ে নেই। কানগুলোকে পবিত্র কোরআনের সুরে পরিতৃপ্ত করি।

পোষাকগুলোকে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের পোষাকে পরিণত করি।

হাতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার প্রেমের হাতকড়া পরাই।

কপালে তাঁর সেজদার নকশা সাজাই।

এরপর দেখুন আল্লাহকে কত ভালো লাগে।

বেহায়াপনা আল্লাহ সহ্য করেন না

প্রিয়, বোনেরা!

অশ্লীলতা ওবেহায়াপনা যখন কোনো জাতির মাঝে ব্যাপক আকার ধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা এ অপরাধটিকে সহ্য করেন না। অতীতেও আল্লাহ তা'আলা বেহায়াপনাকে সহ্য করেননি। উম্মতের নছিহতের জন্য আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এমন অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

সবচেয়ে বেশি বেহায়া জাতি ছিল হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা এ বেহায়পনাকে সহ্য করেননি। পাঁচ প্রকারের গজব দিয়ে তাদের ধ্বংস করেছিলেন।

আমি কওমে লূতের সে অভিশপ্ত অঞ্চলটি ঘুরে এসেছি। সেটি মানুষের জন্য একটি নিদর্শন। মানুষ যেন সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানটি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে।

আজ এ মানবতা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার কারণে লুত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মতো পরিণতীর পুরোপুরি যোগ্য হয়ে গেছে। আল্লাহর আযাব গর্জন করে ফিরছে। বর্ষিত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এই অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে যদি তওবা না করা হয়, তাহলে আল্লাহ এই সমাজকে ধ্বংস করে দেবেন। একে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করবেন। আল্লাহ তাঁর ধরণীকে অপবিত্র থাকতে দেবেন না।

আল্লাহ আগেও ছিলেন, এখনও আছেন। আইন আগে যেমন ছিলো সেটি এখনও আছে। আল্লাহ তা'আলা বেহায়াদের থেকে জমিনকে পবিত্র করবেন। শালীন ও সভ্য সমাজ নিয়ে আসবেন।

চরিত্রবতী সতী-সাধ্বী নারীদের দিয়ে আবার ধরণীকে পবিত্র করবেন। চরিত্রবান পুরুষ-নারী সৃষ্টি করবেন।

তাই বলছি, আল্লাহর ওয়াস্তে তওবা করুন। যে বিপদ গজব ধেয়ে আসছে, তা খুবই ভয়াবহ হবে। মর্মান্তিক হবে। আল্লাহ্ কুফর সহ্য করেন।

ওজনে কম দেওয়া সহ্য করেন।

নামায ত্যাগ সহ্য করেন।

রোযা না রাখা সহ্য করেন।

কিন্তু কসম আল্লাহর, আল্লাহ অসৎ ও অশালীন সমাজ সহ্য করেন না। এই পৃথিবী আল্লাহর। এখানে তাঁর হুকুমই চলবে।

আল্লাহ নিজে লজ্জাশীল, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন। নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা কে তিনি সহ্য করেন না।

প্রিয় বোনেরা! পর্দায় আসুন

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম মহিলাদেরকে পর্দার হুকুম দিয়েছেন। আর পুরুষদের বলেছেন দৃষ্টি অবনত রাখো। আর মহিলাদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখার সাথে পর্দা করার ও আদেশ দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টি অবনত রাখো, পর্দাও করো।

সমস্ত কোরআনে কারীমে কোথাও মহিলাদের নাম উল্লেখ করেননি, শুধু মাত্র হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নাম ছাড়া। চাই নেককার হোক, চাই বদকার। আল্লাহ পাক সকল মহিলাদের নাম পর্দায় রেখেছেন।

কোরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু জুলায়খার নাম উল্লেখ করেননি। উল্লেখ করতে পারতেন; কিন্তু উল্লেখ করেননি। বলা হয়েছে আজিজ এর স্ত্রী। হযরত আছিয়া, অনেক উঁচুমানের নারী ছিলেন, ফেরাউনের স্ত্রী। ঈমানওয়ালা নারী। ফাঁসিতে ঝুলেছেন; কিন্তু ঈমান ত্যাগ করেননি।

আল্লাহ তার নাম উল্লেখ করতে পারতেন; কিন্তু করেননি। বলেছেন ফেরাউনের স্ত্রী।

এমনভাবে হযরত লূত আঃ এর স্ত্রী।

নূহ (আ.)-এর স্ত্রী।

ইব্রাহীম (আ.)-এর স্ত্রীঃ

নাম নেই, কারও নাম উল্লেখ করেননি। এখানে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। ত্রিশ 'পারা কোরআনে শুধু মারইয়াম (আঃ)-এর নাম আছে। আর কোনো মহিলার নাম নেই। আলোচনা আছে, কিন্তু নাম নেই।

মারইয়াম (আ.)-এর নাম উল্লেখ হয়েছে, বিশেষ এক কারণে। একদল মানুষ মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আ.) কে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যা দিয়েছিলো।

وَقَالَتِ النَّصَارَى مَسِيحُ ابْنُ اللهِ -

নাসারারা বলেছে, মাসিহ্ আল্লাহর পুত্র। (সুরা তাওবা, ৩০)

খ্রিস্টানরা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে।

এই অপবাদকে খণ্ডণ করতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিলেন।

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ -

না না, ওতো মারইয়ামের পুত্র ঈসা। (সুরা মারইয়াম, ৩৪)

তো বিষয়টা খোলাসা করার প্রয়োজন ছিলো, তাই আল্লাহ মারইয়াম নামটা উল্লেখ করেছেন। অন্যাথায় আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরআনে নেককার, বদকার কোনো নারীর নামই উল্লেখ করেননি।

একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের নাম প্রকাশ করাও আল্লাহ তা'আলার পছন্দ নয়। তাহলে যে আল্লাহ মহিলাদের নামটি পর্দায় রাখা পছন্দ করেছেন, সেই আল্লাহ কিভাবে পছন্দ করবেন যে, মহিলারা চেহারা খুলে বাইরে ঘুরবে?

অনেকেই বলেন, মনের পর্দাই বড় পর্দা। আরে মনতো আগে থেকেই পর্দায় আছে। হাড় আছে চামড়া আছে, গোশত আছে, আল্লাহ তা'আলা কতগুলো আবরণের মাঝে মনকে লুকিয়ে রেখেছেন। পর্দা হয় চেহারার। আর মনকে রাখতে হয় পবিত্র। দু'টি মিলে হবে পর্দা। চেহারা ঢাকার কথা এজন্য বলা হয়েছে, যাতে পর পুরুষ তার চেহারা না দেখে।

পুরুষদের জন্য দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের জন্য আদেশ চেহারা ঢেকে রাখার।

আযাদী না সর্বনাশ?

প্রিয় বোনেরা!

আল্লাহর বিধান মেনে চলার মাঝেই মুক্তি। এটাই প্রকৃত সুখের জীবন। ইউরোপে গিয়ে দেখে আসুন, স্বাধীনতার নামে ইউরোপের নারীরা পোষাক ছুড়ে ফেলেছে। কিন্তু এযুগের সবচেয়ে নির্যাতিত নিপিড়িত হলো ইউরোপের নারীরা, আমেরিকার নারীরা। তারা খেলনার মতো এক হাত

থেকে আরেক হাতে ঘুরে বেড়ায়। দু'চারটি সন্তানকে লালন পালন করার কথা ছিলো যাদের, তারা আজ কত পুরুষের হাতের খেলনা। এ হলো স্বাধীনতা। তারা আজ নারী স্বাধীনতার নামে এয়ার হোষ্টেজ হয়েছে। যাকে এক স্বামীর বৈধ দৃষ্টির জন্য তৈরি করা হয়েছিলো, সে এখন দু'শ পুরুষের কামনার দৃষ্টির শিকার। প্রত্যেকের প্রতি হাসি মুখে তাকাতে হচ্ছে। তাদের পানি পান করাচ্ছে। চা পান করাচ্ছে। খানা খাওয়াচ্ছে। কোনো যাত্রী যদি অসদাচরণ করে তাও হাসি মুখে বরণ করে নিতে হচ্ছে।

এ হলো নারী স্বাধীনতার রূপ। স্বাধীনতার ফলাফল। এ স্বাধীনতা নারীকে কি উপহার দিয়েছে? দিয়েছে অমর্যাদা ও গ্লানী। এ স্বাধীনতায় পুরুষকে দিয়েছে কামনা চরিতার্থ করার সুযোগ। আর তৈরি হয়েছে বেহায়া আর বেলেল্লাপনার পথ। অথচ ইসলাম নারীকে বসিয়েছে মর্যাদার আসনে। মানব সন্তানদের মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্য আদর্শ মা হিসেবে তৈরি করেছে। বাইরের কাজ পুরুষের, আর ঘরের কাজ নারীর।

মুসলমান নারীদের নমুনা হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণকে পবিত্র কোরআনে মর্যাদা দান করেছেন। কোরআনে কারীমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের নয়টি বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছে। আমি আপনাদের তার একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি।

আল্লাহ্ বলেন, يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ.

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সধারণ মহিলাদের মতো নও।

এর অর্থ হলো, হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মতো নারী জগতে আর কেউ নেই।

তোমরা এত মর্যাদাবান, শ্রেষ্ঠ, এত মহিমান্বিত, তোমাদের মতো মহিলা জগতে আর একজনও নেই।

তাহলে যেসব মহিলা তাদের পেছনে চলবে, তারাও তাদেরই মতো মর্যাদার অধিকারী হয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আর যদি আজকের বাজারী মহিলার মতো চলো, তাহলে ধ্বংস ছাড়া কিছুই দেখবেনা। ভবিষ্যতে খুবই অন্ধকার ও ভয়াবহ পরিণাম অপেক্ষা করছে।

একদিন উটের পিঠে ফযল ইবনে আব্বাস (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোমরের সাথে লেগে বসে আছেন।

হজ্জের সময়। উট মিনায় প্রবেশ করলো। এক মহিলা এলো মাসআলা জিজ্ঞেস করতে, মুখ খোলা ছিলো, যেহেতু এহরাম অবস্থায় ছিলো তাই মহিলার ঘোমটা ছিল না।

মহিলা মাসআলা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজল ইবনে আব্বাসের চেহারা ধরে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন যাতে মহিলার দিকে দৃষ্টি না পড়ে।

ফজল (রাযি.)-এর পিতা হযরত আব্বাস (রাযি.) (নবীজীর চাচা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা কথা বলে চলে গেলো। হযরত আব্বাস (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূলঃ আপনি আপনার ভাইয়ের মুখটা এভাবে পিছনে ঘুরিয়ে দিলেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুজনই সুশ্রী কিনা, তাই এমনটা করলাম। আমার মনে আশংকা জেগেছিলো পাছে শয়তান আবার এদের বিভ্রান্ত করে ফেলে কিনা।

এই ঘটনা এই নীতির মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন, ওহে বিশ্বের মুসলমান নারী ও পুরুষরা, আমি এমন পবিত্র মনের মানুষগুলোর মধ্যেও এমন সাবধানতা অবলম্বন করিয়েছি, আর তোমরা কি করছো? সাবধান হও।

প্রিয় বোনেরা! আল্লাহর শিক্ষা অটল ও অবিচল, অপরিবর্তণীয়। আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে বলেছেন দৃষ্টি অবনত করো। আর মহিলাদের বলেছেন, পর্দায় থাকো। আদেশটা মহান আল্লাহর। এই আদেশ মৃত্যু পর্যন্ত চলবে।

আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে হবে

প্রিয় বোনেরা! আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়া অযথা তৈরি করেননি। খেল তামাশার জন্য তৈরি করেননি। আর আমাদেরকেও অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আমাদের লাগামহীনভাবে তো ছেড়ে দেননি যে, যা ইচ্ছা করবো। একেবারে মুক্ত স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা করবো। না, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ-

জালেমরা যা কারে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে বে খবর মনে করো না। (সুরা ইবরাহীম. ৪২)

জালেম জুলুম করছে, কেউ ধরছেনা। আমরা কি ভাবছি গোপনে অন্যায় করবো, কে দেখবে? আঁধার রাত, সবাই ঘুমিয়ে, কে দেখবে? কেউ দেখবে না। আরে বেখবর! যে দেখার সেতো দেখছেন। অবশ্যই একদিন তিনি তোমার লাগাম টেনে ধরবেন।

সেদিন তোমার কোনো শক্তি থাকবে না, শক্তিহীন হয়ে পড়বে তুমি। অসহায় হয়ে যাবে। সব শক্তির উৎস যে আল্লাহ, যে আল্লাহ আমাকে শক্তি দিয়েছিলেন, তিনি যখন সে শক্তি কেড়ে নেবেন, তখন আমাদের মতো অসহায় আর কেউ থাকবে না।

মদীনার এক নারীর কথা আপনারা শুনে থাকবেন হয়তো, হযরত উমর ফারুক (রাযি.)-এর সময়কার ঘটনা।

মদীনার অলিগলি ছদ্ম বেশে ঘুরছেন হযরত উমর। খলিফাতুল মুসলিমীন। নির্জন, নিরবতা চারদিকে, হাটছিলেন হযরত উমর (রাযি.)। রাতের নিরবতা ভেদ করে একটি ঘর থেকে দু'জন নারীর কথা-বার্তার আওয়াজ আসছে। দাঁড়িয়ে গেলেন হযরত উমর (রাযি.)। শুনছেন দুই নারীর কথা।

মা মেয়েকে বলছে দুধে একটু পানি মিশিয়ে নাও, তাতে কিছু টাকা বেশি পাওয়া যাবে। মেয়ে উত্তর দিলো, এটা করা অন্যায় হবে, প্রতারনা হবে। তা ছাড়া খলিফা হযরত উমর বলেছেন, কেউ যেনো দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি না করে।

মা বলছে, আরে এতো রাত্রে খলিফা ওমর কি আর দেখছেন, যে তুমি দুধে পানি মিশিয়েছো?

মেয়ে এবার জবাব দিলো, খলিফা ওমর দেখছে না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো দেখছেন।

এসব কথোপকথন শুনে হযরত উমর (রাযি.) উৎফুল্ল মনে ফিরে গেলেন। এই অন্ধকার রজনীতে তিনি খুঁজে পেয়েছেন এক খণ্ড হিরা। পরের দিন হযরত ওমর (রাযি.) নিজের ছেলে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের সাথে সে মেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দিলেন।

দেখুন! সে সময়কার নারী। ঈমানের ভিত্তি কত মজবুত ছিলো। নিঝুম রাতের এ ঘটনা আজ চৌদ্দশত বছর পরও আমাদের জন্য এক শিক্ষা।

প্রিয় বোনেরা! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে কিছুই গোপন নেই। সব তিনি দেখেন, ঘরের ভেতর দরজা লাগিয়ে পর্দা দিয়ে যদি মনে করি আর কেউ তো দেখছে না। আমার পাপ কোনো মানুষ তো দেখছে না।

আল্লাহ বলতেছেন,

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔

তোমরা তিনজন আছো, চতুর্থজন আমি। আল্লাহ। وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ তোমরা পাঁচজন; তা হলে ষষ্ঠ জন আমি আল্লাহ। (সুরা মুযাদালাহ)

وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ তার থেকে কম, তিন, দুই, এক। তারও বেশি, পাঁচ হাজার।

اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا তোমাদের আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন। ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا তুমি গোপনে যা কিছু করেছো। একদিন তা তোমাকে দেখিয়ে দিবে যে, তুমি কি কি করেছো। (সুরা মুযাদালাহ, ৭)

আস্তে কথা বলছো, তাও আল্লাহ শুনছেন। তোমাদের অন্তরের কথাও তিনি জানেন। আর কিছু কথা এমন আছে, যা মানুষ শুধু কল্পনা করে আল্লাহ তাও শোনেন। অথচ কল্পনা যে করছে, সেও শোনে না।

মানুষের মনের কল্পনা, সে নিজেও কানে তা শোনেনা, শুধু কল্পনা করে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে শুনলেন? এটাকে হাদীসে নফস বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি যে নিজে নিজে কল্পনা করছো, আমি তাও শুনি। তাহলে বলুন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর কাছ থেকে কিভাবে গোপন রাখবেন? লুকাবার কি কোনো পথ আছে? নেই।

আপনি কারও দিকে খারাপ নজরে তাকিয়েছেন, কারও দিকে ভালো নজরে তাকিয়েছেন, আপনার মনের খবর তো কেউ জানে না, শুধু আল্লাহ জানেন।

আপনার চোখ মন্দটা দেখছে, আল্লাহ তা'আলা তাও দেখছেন। নজরের খারাবীর কারণে অন্তরেও খারাপ ধারণা, মন্দ আকাঙ্খা তৈরি হয়েছে, এটাও আল্লাহর দৃষ্টির মধ্যে। এসব আল্লাহ তা'আলা দেখছেন।

সম্মানিত লেখকগণ, (কিরামন কাতিবীন) তা রেকর্ড করছেন, মানুষ যা করছে প্রকাশ্যে, গোপনে, মনে মনে। এমনতো নয় যে, অন্ধকারে আল্লাহ দেখবেন না, অথবা জোরে, জোরে উচ্চস্বরে বললেই আল্লাহ্ শোনবেন। না, এমন নয়। তুমি জোরে বলো, আর আস্তে বলো, আল্লাহ্ সব শোনেন। যা তুমি রাতের আঁধারে করছো, যা তুমি দিনের আলোয় করেছো।

প্রিয় বোনেরা!

আমাদের চরিত্র সুন্দর করতে হবে। আমল ঠিক করতে হবে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে জায়গায় জায়গায় পূর্ববর্তী উম্মতগণের কথা বলেছেন, তাদের ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য শুধু শুধু নয়; বরং আমাদের সর্তক করেছেন, যেনো আমরা আমাদের আচরণ, আমাদের জীবনাচার সুন্দর করি।

কুরআনে বর্ণিত নূহ (আ.)-এর কওমের ঘটনা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে আমাদের পূর্বের উম্মতদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, আর সতর্ক করেছেন, আমরা শেষ জমানার উম্মতরা যেনো সেই পরিণতির দিকে না যাই।

মহা প্লাবন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, এক জাতি ছিলো কাওমে নূহ্। নূহ (আ.)-এর জাতি। যারা এ জমিনকে অন্যায় আর অবিচার দ্বারা ভরে ফেলেছিলো। তারা আমার নবী নূহ (আ.) কে বললো,

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ-

সে আযাব নিয়ে আসো, যার ভয় আমাদের দেখাতে এবং সেই আযাব নিয়ে আসো, যার ওয়াদা তুমি করেছো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এরপর আমার দিন এলো। (সুরা আরাফ, ৭০)

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَآءِ- بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ- وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ- عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ-

আমি সমস্ত জমিনকে ফোয়ারা বানিয়ে দিলাম, জমিনের তল থেকে পানি উঠতে লাগল। আসমান থেকে পানি নামাতে লাগল। আর সমস্ত দুনিয়ায় সে পানি ছড়িয়ে পড়ল। (সুরা ক্বামার, ১১/১২)

এক তাফসীরের কিতাবে আছে। আমি পড়েছি। সেদিন যদি আল্লাহ তা'আলাা কারও উপর রহম করতেন, তাহলে তা এক মহিলার প্রতি করতেন।

যে মহিলা তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। হয়ত কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে। কোনো পাহারের উচুতে উঠে হয়তো বাঁচতে পারবে। মহিলা দৌড়ে দৌড়ে একটি উঁচু পাহাড়ে উঠল যার থেকে উঁচু কোনো পাহাড় ছিলো না। মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে সেই পাহাড়ে উঠে বাঁচতে চাইল। এক সময় বন্যার পানি তার পা ডুবিয়ে হাঠু পর্যন্ত উঠে গেলো। এরপর বুক পর্যন্ত। বাচ্চাটিকে পানি থেকে বাঁচানোর জন্য উপরে তুলে ধরলো। পানি আরও বৃদ্ধি পেয়ে তার গর্দান পর্যন্ত উঠলো। মহিলা বাচ্চাকে মাথার উপর তুললো। যদি বাচ্চা বেঁচে যায়। এর পর পানি মা সহ বাচ্চাকেও ডুবিয়ে দিলো।

দেখুন গজবের ভয়াবহতা এমনই, বাচ্চাকেও ছাড়ে না, মাকেও না। দাপুটি বিত্তশালীকেও না, অসহায় গরীব কেও না। সবাইকে বরাবর করে দেয়।

হযরত নূহ (আ.)-এর এক সন্তানও সে আযাবের শিকার। তিন বন্ধু পানি দেখে দৌড়ে এক পাহাড়ি সুড়ঙে ঢুকে পড়ল। উপরের মুখ পাথর দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে দিল। যাতে ভিতরে পানি না প্রবেশ করে, কিছুক্ষণ পর তিনজনেরই প্রচণ্ড পেশাবের বেগ হলো, অসহ্য হয়ে গর্তের ভেতরই তিনজন পেশাব করতে বসল। আল্লাহ তিনজনের পেশাব জারি করে দিলেন, পেশাব আসছেই, বেগও কমছেনা। পেশাব করতে করতে তারা তিনজন নিজেদের পেশাবের বন্যায় মারা গেলো।

আজ আমাদের সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। আমরা আজ এমন আযাবের উপযুক্ত হয়ে গেছি।

কওমে আদ এর উপর গজব

কাওমে আদ অনেক শক্তিশালী জাতি ছিলো। এ শক্তি তাদের অহংকারী, দাম্ভিক আর জালেমে পরিণত করেছিলো। তারা বলতে লাগলো,

مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً কেউ কি আছে আমাদের থেকে বড় শক্তিশালী? থাকলে আসো না, আমাদের কিসের ভয়? (সুরা হা মীম সেজদা, ১৫)

তখন আল্লাহ তা'আলাা বললেন,

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً۔

হে আদ জাতী! না, যে, তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, সে তোমাদের চেয়ে বড় শক্তিশালী। (হা মীম সেজদা, ১৫)

কওমে আদের যখন পাপের বোঝা পরিপূর্ণ হলো, তাদের অহংকার দাম্ভিকতা, তাদের অন্যায় যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলাা আযাবের দরজা খুলে দিলেন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এসে গেলো। দারিদ্রতা বাড়তে লাগল। অনাহার পিপাসা তাদের পাগল করে তুললো। তারা আমাদের মত দেহের মানুষ ছিল না, ত্রিশ চল্লিশ হাত পর্যন্ত লম্বা হতো। আটশ নয়শ বছর বাঁচত। বৃদ্ধ হতো না। অসুস্থও হতো না। দাঁত পড়তো না। দুর্বল হতো না। চোখের তেজ কমত না। সুস্থ-সবল অবস্থায় শুধু মারা যেতো। মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কোনো সমস্যা হতো না। দুনিয়ার সমস্ত সুখ তারা ভোগ করত।

সেই জাতি এখন আল্লাহর আযাবে নিপতিত। ক্ষুধায় কাতর হয়ে হালাল হারাম সব খেতে লাগলো। কুকুর খাওয়া শুরু করলো। বিড়াল খেয়ে ইদুর খেয়ে জীবন বাঁচাতে শুরু করল। বৃষ্টি নেই ক্ষেতে ফসল নেই খাদ্য নেই। অভাবের তাড়নায় ক্ষুধার যন্ত্রণায় সামনে যা পেতো সব খেয়ে ফেলত। এর পরও বৃষ্টি হলোনা। জমিনে ফসল হলো না। এ অবস্থায় গাছের ছাল পাতা পর্যন্ত খেতে লাগল, তাও শেষ হয়ে গেলো, কিন্তু রহমতের বৃষ্টি হলো না।

তখন তারা বাধ্য হয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে গেলো, বললো আমাদের বৃষ্টি দাও। আল্লাহ বৃষ্টি দাও। তারা এমন আগেও করেছিলো, বিপদ আসলে আল্লাহর কাছে সাহয্য চাইত, পরে সব ভুলে আবার মূর্তি পুজা করতো।

আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা শুনে তিনটি মেঘ খণ্ড আকাশে তাদের দেখালেন, বললেন, বল তোমরা কোনোটি নিবে। যে কোনো একটি বেছে নাও।

একটি সাদা।

একটি লাল।

একটি কালো।

তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো, বললো, সাদা মেঘে কিছুই নেই। লালটি বাতাস বইবে। আর কালো মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আমরা কালোটি নিলাম।

আওয়াজ এলো, পৌঁছে যাবে।

তারা বাড়ি পৌঁছে গেলো। তারা বলতে লাগলো, বৃষ্টি হবে। আমাদের অভাব দূর হবে। জমিন ফসল দিবে।

এরপর একদিন বৃষ্টি এলো। আল্লাহ তা'আলাা বৃষ্টি দিলেন। তারা বলতে লাগলো বৃষ্টি আসছে।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ

তারা বলতে লাগলো, দেখো বৃষ্টি আসছে। (সুরা আহকাফ-২৪)

হুদ বললেন,

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ-

এটা বৃষ্টি নয়, আযাব।

যা তোমরা আমার নবী হুদ কে বলতে, কে আছে আমাদের থেকে বড়? কে আমাদের কি করবে? এখন তৈরি হও।

رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ- تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا-

এ হচ্ছে এক প্রলয়ংকরী ঝড়, যার মাঝে রয়েছে ভয়াবহ আযাব/এ ঝড় তার মালিকের নির্দেশে সব কিছুই ধ্বংস করে দেবে। আহকাফ. ২৫

এখন দেখো তোমাদের রব কিভাবে তোমাদের ধ্বংস করেন। তাদের ঘরকে বাতাস উড়িয়ে নিলো। তাদের কেও বাতাস উড়িয়ে নিল। ষাট হাত লম্বা লম্বা মানুষগুলোকে তুলার মতো বাতাসে উড়িয়ে নিল। বাতাসের প্রবল বেগে মানুষ একজনের সাথে আরেকজন টক্কর খাচ্ছে।

কিছু লোক পাহাড়ি গর্তের ভেতর প্রবেশ করলো, বাতাস সেই গর্তের ভেতর এমন জোরে প্রবেশ করলো; বাতাসের প্রচণ্ডতা এত বেশি ছিলো যে, গর্তের ভেতর বাতাস ঢুকে ভিতরের যা কিছু ছিল সব বের করে নিয়ে আসলো। তারা বাতাসে উড়ছে, মাথায় মাথায় টক্কর খাচ্ছে। মাথা ফেটে যাচ্ছে। চেহারা থেতলে গেছে। এরপর আযাবের ফেরেশতা মানুষগুলোকে উল্টিয়ে জমিনের উপর ফেলে দিলো। মাথা আলাদা হয়ে গেলো, শরীর আলাদা হয়ে গেলো।

এরপর মহান রাব্বুল আলামীন উচ্চস্বরে বললেন,

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ

আরও কি কেউ বাকি আছে? তাহলে দেখাও।

যদি একটি মানুষ ও বাকি থেকে থাকে তাকে খতম করে দেবো। কেউ ছিলনা, কিছুই ছিল না। আল্লাহর আযাব আল্লাহর গজব সব ধ্বংস করে দিয়েছে।

প্রিয় বোনেরা! এর পর এলো কওমে সামূদ জাতির পালা। তারা শুনেছিলো আদ জাতিকে আল্লাহ তা'আলাা কঠিন আযাব দিয়ে ধ্বংস করেছেন। উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তাই সামূদ জাতি পাহাড়ের ভেতরে ঘর তৈরি করলো। ভাবনা এমন ছিলো যে, ভেতরে বাতাস ঢুকবে না। আমাদের কে কি করবে। ভিতরে বাতাস ঢুকতে পারবেনা। এরপরও নাফরমানী ছাড়লে না। আল্লাহ তা'আলাার শক্তির সাথে টক্কর দিলো।

আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য বাতাসের গজব দিলেন না। দিলেন অন্য রকম আযাব। একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন, ফেরেশতা এমন উচ্চস্বরে চিৎকার দিলো যে, সামূদ জাতির কলিজা ফেটে গেলো। চেহারা নীল হলো ভয়ে। মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ তাদের হালাক করে দিলেন। তাদের চালাক, পাহাড়ের গভিরে ঘর করেও তারা নিজেদেরকে আল্লাহর গজব থেকে বাঁচাতে পারল না। আল্লাহর ক্ষমতার কাছে সব কৌশলই ব্যর্থ হলো।

কওমে শোয়াইব-এর উপর ভয়াবহ গজব।

এরপর আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে শোয়াইব (আ.)-এর কওমের কথা বর্ণনা করেছেন। সে কওম (জাতি) ব্যবসা বাণিজ্যে খুব দক্ষ ছিলো বেচা-কেনায় প্রতারণা করতো, ওজনে কম দিতো, মন্দ জিনিস ভালো বলে বিক্রি করতো। ক্রেতা চিন্তা করতো বিক্রেতাকে কিভাবে ঠকানো যায়। আর বিক্রেতা চিন্তা করতো ক্রেতাকে কিভাবে ঠকিয়ে দেওয়া যায়। আজ আমাদের মাঝে যা হচ্ছে, তা সে সময়ও হতো। সে জাতি এভাবে প্রতারণা আর চালাকি করে সমস্ত পৃথিবীর ব্যবসাকে কবজা করে নিলো।

এসব দেখে হযরত শোয়াইব (আ.) তাদের বললেন, তোমরা এমন কাজ থেকে বিরত হও। ফিরে আসো।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ -

ওজন সঠিক করো, ওজনে কম করো না। (সুরা বনী ইসরাঈল–৩৫)

তারা জবাব দিলো।

হে শোয়াইব! তুমি মসজিদে চলে যাও, আমাদের ব্যাবসায় নাক গলাতে এসোনা। তুমি বলতে চাও, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের তরীকা ছেড়ে দেই। আর আমরা আমাদের ব্যবসার নিয়ম তোমার কথা মতো চালাই। তা হবে না, আমরা আমাদের বাপ দাদাদের নিয়ম মতো চলবো।

আজ যেমন ইমাম সাহেব যদি বলেন, ভায়েরা এটা করবেন না। ওটা করা মন্দ। মা বোনদের পর্দায় রাখুন, বেপর্দা হয়ে রাস্তায় চলবে না।

গান বাদ্য শোনবেন না। তাহলে চারদিকে সেই ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে শত শত কণ্ঠ। বলে– আপনি নামায পড়াবেন, বেশি কথা বলার জন্য আপনাকে ইমাম হিসাবে নিয়োগ দেইনি। আপনারা মৌলভীরাই সমাজটাকে পিছিয়ে রেখেছেন। মেয়েদেরকে ঘরে বন্দি করে রাখতে চান। আরও কত রকমের যুক্তি বাহানা, গালমন্দ। এখন ভাবুন তো আমাদের আচরণগুলো কওমে শোয়াইবের আচরণের মতো হচ্ছে কিনা?

তো কওমে শোয়াইব বললো,

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا -

তারা বলল, হে শোয়াইব! আপনার নামায কি আপনাকে এটাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐ সব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ দাদারা যাদের উপসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেবনে? (সুরা হুদ, ৮৭)

হে শোয়াইব! তুমি নিজের ঘরে বসে থাকো। আমাদেরকে তোমার ওয়াজ করতে হবে না, আমাদেরকে নিজের ব্যবসা করতে দাও।

এরপর আল্লাহ তা'আলাা তাদের জন্য তিনটি আযাব প্রেরণ করলেন।

১। اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ভূমিকম্প।

২। اَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ভয়ংক চিৎকার।

৩। اَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ আগুনের বৃষ্টি।

আমাদের জামাত কাওমে শোয়াইব-এর এলাকায় গিয়েছিলো। সে অঞ্চল এমন ঠাণ্ডা যে, আমরা যখন গেলাম তখন সেখানে তিন ফুট বরফে ঢাকা ছিলো।

আল্লাহ তাদের উপর গরম বাতাস ছেড়ে দিলেন। গরমে তাদের দেহ ঝলসে গেলো, ফোস্কা পড়ে গেলো। এরপর আল্লাহ তা'আলাা তাদের উপর ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়ে দিলেন, প্রচন্ড গরমে অস্থির সে জাতি যখন বুঝলো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তারা বাইরে এলো, বলতে লাগলো, আহ্! কি আনন্দ, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে! আকাশে কালো মেঘ জমেছিল, এ দেখে তারা আনন্দিত হয়ে বলতে লাগল, আহ্ বৃষ্টি আসছে। এসময়ই জমিনে ভূমিকম্প সৃষ্টি হলো, সাথে ফেরেশতার বিকট চিৎকার, আর আকাশের কালো মেঘ লাল হয়ে উঠল। এরপর তা থেকে বড় আগুনের খণ্ড পড়তে লাগল এবং সমস্ত জাতিকে এবং সে অঞ্চলকে জ্বালিয়ে শেষ করে দিলেন।

প্রিয় বোনেরা!

আজ আমাদের অবস্থা কি? আমরা কোন পথে চলছি? কওমে লুত। কওমে আদ, কওমে সামূদের চেয়ে পাপের বোঝা আমরা কি কম বহন করছি? আজ আমাদের সমাজ, আমাদের চাল-চলন তো এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমরা আল্লাহর গজবকে ডেকে আনছি। মানুষ এখন আল্লাহর অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মহিলারা পর্দার পরওয়া করছেনা। এমন পোষাক পরছে যা পুরুষের কামনাকে উস্কে দিচ্ছে। নারী-পুরুষ বাধাহীন মেলা-মেশা করছে। বড়-বড় গোনাহ করেও অন্তরে অনুশোচনা আসছেনা। অন্তরে আযাবের ভয় নেই, তাই রহমতের দুয়ার রূদ্ধ হয়ে গেছে।

আজ যা করার করো, কিন্তু...

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔

নিশ্চই কান, চোখ প্রত্যেকটা অঙ্গ জিগজ্ঞাসিত হবে। (সুরা বনী ইসরাইল, ৩৬)

এবং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন যে, আমার কাছে হিসাব করে আসবে। তোমার চোখকে জিজ্ঞেস করবো, কী দেখে এসেছো? কী অনুভূতি নিয়ে এসেছো? এবং সেদিন এই চোখের উপর তোমার কোনো

শক্তি চলবেনা; বরং আমার নির্দেশে সে কথা বলতে থাকবে। শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ কথা বলবে এবং তুমি এটা বলবে যে; হে আমার শরীরের অঙ্গ, তোমার কি হলো? তুমি আমার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছো? তখন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জবাব দিবে।

اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔

আমি কি করবো, আমাকেত তিনি বলাচ্ছেন, যিনি সমস্ত জিনিসের শক্তিদাতা।

বান্দা বলবে

سَلَقَكُنَّ اِنْ كُنْتَ اَنَايِلْ

তোমার কারণেইতো আমি আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিলাম। আর আজ তুমিই আমার বিপক্ষে চলে গেছো?

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۔

আজ তোমাদের জবান আমি বন্ধ করে দেবো, তোমার হাত পা তোমার কৃত কর্ম-গুলো ব্যাখ্যা করবে। (সুরা ইয়াসীন-৬৫)

দেখুন! এখন যে অবস্থায় দুনিয়ার নারী-পুরুষরা চলছে; তাতে তারা মনে হয় ভাবছে যে, আমাদের ব্যাপারে কেউ খবর রাখছেনা। কেউ দেখছেনা। না, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা সব দেখছেন, আমাদের সবকিছু মহান রাব্বুল আলামীনের দৃষ্টির মধ্যে। আমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যা করছি আল্লাহ তা দেখছেন।

তাহলে কেন আমরা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জীবনের জন্য আল্লাহকে ভুলে দুনিয়ার মায়ায় এমনভাবে আটকে আছি। আখেরাতের জীবন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেছি। চিরস্থায়ী নিবাস পরকাল ভুলে গেছি। আমাদের পাপের কারণে আল্লাহর আযাব আসতে পারে, তার সম্পর্কেও আমরা উদাসীন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ۔

বলে দিন, আমার বান্দা বান্দিদেরকে, মহিলা পুরুষকে, যা কিছু তোমরা করো আমি সে ব্যাপারে বে'খবর নই। (সুরা ইবরাহীম, ৪২)

কথা হলো; তাহলে আল্লাহ শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ -

পাকড়াও করার দিন একদিন আসবে। এখন তোমাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। (সুরা ইবরাহীম, ৪২)

এখন তোমাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে। যেদিন তিনি আমাদের পাকড়াও করবেন, সেদিন আমাদের অসহায়ত্বের সীমা থাকবে না।

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ يُصِيبُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

যারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন অথবা এমন আযাব অবতীর্ণ করবো, যার সম্পর্কে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। (সুরা নাহল–৪৫)

প্রিয় বোনেরা! আমরা যদি মনে করি আল্লাহ তা'আলাা তো দয়ালু, রহমানুর রাহীম। বান্দার পাপ তিনি ক্ষমা করবেন। দুনিয়াতে পাপ করলে ফেরেশতাগণ শাস্তি দেননা, এই সুযোগে যদি আমরা গোনাহ করি। তাদের জন্য সাবধানতা।

কারণ তিনি মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তাঁর নিয়ন্ত্রণ আমাদের গর্দানে। আমাদের অন্তরে, দেমাগে, চিন্তায়, চেতনায়। শরীরের প্রত্যেকটি পশমের গোড়ায় গোড়ায় তাঁর নিয়ন্ত্রণ। আল্লাহ তা'আলাা আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রক। আজ যে চোখে মন্দকে দেখছি। আল্লাহর গজবের থাপ্পড় যদি এসে যায়; তাহলে আমার চোখ দু'টি বেরিয়ে আসবে। ছিটকে পড়ে যাবে। আমি অন্ধ হয়ে যাবো। আমাদের বাহাদুরী শেষ। যে কান দিয়ে গান শুনি; যদি আল্লাহর গজবের তীর এসে কানকে স্তব্দ করে দেয়, আমি বধীর হয়ে যাবো। শেষ হয়ে যাবে আমার উদ্ধত আচরণ। আসুন ছেড়ে দেই এসব গান-বাজনা। ছেড়ে দেই চোখের পাপ। হাতের পাপ, মুখের পাপ। মনে রাখবেন, বান্দা চরম অবাধ্য হলে আল্লাহ তা'আলার গজব নেমে আসে।

তাহলে গোনাহ ছাড়তে হবে, আল্লাহ তা'আলাাকে রাগান্বিত করা যাবে না। আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে থাকতে হবে। আর আল্লাহর রহমতের আশা অন্তরে রাখাতে হবে। আযাবের ভয় এমন থাকতে হবে,

হায় যদি আমি হাত দ্বারা -এই নিষিদ্ধ কাজটি করি, তাহলে যদি আল্লাহ তা'আলা আমার হাতকে অবশ করে দেন? তাহলে আমার কি উপায় হবে? আর এই পা দ্বারা কোনো অন্যায় করলে, আগে ভাবতে হবে, হায়! যদি আল্লাহ আমার পা অবশ করে দেন।

এমন আযাবের নিদর্শন তো দুনিয়াতে বহু আছে। হাত দ্বারা অন্যায় করার কারণে হাত অবশ হয়ে গেছে। পা অবশ হয়ে গেছে। যবান বন্ধ হয়ে গেছে। চোখের আলো নিভে গেছে। এসব আযাবের ভয় আমাদের অন্তরে থাকতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়কার ঘটনা : এক ইহুদী সরদার ষড়যন্ত্র করলো, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করবে, এক ইহুদী বলল আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অন্য দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখবো, এই সুযোগে তুমি তাকে কতল করে ফেলবে।

তারা গেলো। একজন রাসূলুল্লাহর সাথে কথা বলতে লাগল, আরেকজন তরবারীর বাটে হাত দিলো, কিন্তু সে হাত আর নড়লনা, তরবারীর বাটে হাত আটকে গেলো। সে ইহুদী অনেক চেষ্টা করেও হাত আর উপরে তুলতে সক্ষম হয়নি।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর স্ত্রী সারা কে জালেম বাদশা ধরে নিয়ে গেলো, তার মনে খারাপ ইচ্ছা ছিলো। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সামনে কুদরতের দরজা খুলে দিলেন, ইবরাহীম (আ.) দেখলেন, বাদশা খারাপ নিয়তে হযরত সারাকে ধরতে হাত বাড়িয়েছে, আর তার হাত অবশ হয়ে ঝুলে পড়ছে। আবার হাত বাড়িয়েছে আবারও এইভাবে হাত অবশ হয়ে পড়ল। তাহলে দেখুন আল্লাহ তা'আলা যেভাবে এ জালেমদের শাস্তি দিয়েছেন, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা সব পাপীকেও আযাবে নিমজ্জিত করতে পারেন। তিনি শক্তিশালী ক্ষমতাধর। মহা পরাক্রমশালী।

وَلَاتَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

হে জালেমগণ, আল্লাহকে গাফেল মনে করো না।

এসব কাজ যা আমি বলেছি সব জুলুম অন্যায়। গান শোনাও একটি অন্যায়। আরে আল্লাহর বান্দা! এর থেকে বড় জুলুম আর কি হতে পারে যে আল্লাহর আদেশ নিষেধকে তোয়াক্কা করলো না।

আরে আল্লাহর বান্দা-বান্দিরা! শোনো, এই গান-বাদ্য, নাচ-গানকে যে সব সম্প্রদায় নিজেদের ধ্যান জ্ঞান করে নিয়েছিল সে সব জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। দুনিয়ার ইতিহাস পড়। দেখবে যে সব সম্প্রদায় সারাক্ষণ গান-বাজনার সাধনায় মগ্ন থাকত, যে জাতির সন্তানরা হাতে সানাই, গিটার নিয়ে চলা-ফেরা করতো। তাদের হাটা চলা নিয়ন্ত্রণ হতো সুরের তালে এবং নাচনেওয়ালী বাইজীদের গানের মজলিস থাকত জমজমাট। সেই জাতির অবস্থা আকাশ আর জমিন দেখেছে। আকাশ সাক্ষী, জমিন সাক্ষী। বাতাস সাক্ষী, এই ভূমির বিশালতা সাক্ষী, বসন্তের উজ্জলতা সাক্ষী। সে জাতির উপর ধ্বংস এসেছে। সে জাতির উপর গজব এসেছে। সে জাতি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কোনো শক্তিই তাদের বাঁচাতে পারেনি। তাদেরকে তাদের পারমানবিক শক্তিও বাঁচাতে পারেনি। বৈজ্ঞানিক কৌশলও কাজে আসেনি, রাজনীতি ও কাজে আসেনি। কাফের হোক আর মুশরিক হোক, যে জাতি গান-বাদ্য রাগ-রাগীনী নিয়ে মশগুল। যে জাতি যিনা ব্যাভীচারে মশগুল। যে জাতি সুদ ঘুষের বিনিময়ে কাজ করায়, আল্লাহ তা'আলাা তাদের শিকড়সহ নির্মূল করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলাা সে জাতির উপর কঠিন থেকে কঠিন আযাব গজব বর্ষণ করেন। এসব দুর্ভাগাদের না দুনিয়াতে সম্মান আছে, না আখেরাতে।

গোনাহ ছাড়ো, সব জায়গায় ইজ্জত পাবে

প্রিয় বোনেরা!

আজ আমাদের মাঝে নানা রকমের হারাম কাজ বিনা দ্বিধায় পালন হচ্ছে। হারামটাকে হারামই মনে করছেনা। কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনছে আর রাস্তায় হাটছে। ছেলে-মেয়ে সবারই এক অবস্থা। নামাজের খবর নেই। পর্দার তোয়াক্কা করেনা, ও আল্লাহ! তোমার বান্দাদের রহম করো।

প্রিয় বোনেরা! এই কান দু'টিকে হারাম শোনা থেকে বাঁচাতে হবে। তাহলে জগতের প্রতিটা বালুকণা যে আল্লাহ্ আল্লাহ্ তসবীহ্ জপে তা শুনতে পাবেন। শুনতে পাবেন প্রতিটি গাছ, গাছের পাতা, একেকটি পাথর, একেকটি পাহাড়, একেকটি ইট কিভাবে মহান আল্লাহর নামে জিকির করে।

এ কানকে যে হারাম থেকে বাঁচাবে, এই চোখ জোড়াকে যদি হারাম দেখা থেকে বাঁচানো যায়। এই জবানকে যে হারাম বলা থেকে বাঁচাবে। এই পেটকে যে হারাম খাওয়া থেকে বাঁচাবে। তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার।

প্রিয় বোনেরা!

আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা যাবে না। এমন দয়াময় রবকে না মানা তাঁর আনুগত্য না করা অনেক বড় অকৃতজ্ঞতা। বরবাদ হাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলাা কারও উপর জুলুম করেন না। আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছি। আল্লাহর প্রভুত্ব তার বড়ত্ব সব সময় চলতে থাকবে। তাহলে আমাদের অবশ্যই তাঁর গোলামী মেনে নিতে হবে।

সমস্ত পাপ থেকে তাঁর নাফরমানী থেকে খাঁটি মনে তওবা করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দার তওবার অপেক্ষায় থাকেন। বাচ্চা মাকে হারালে যেভাবে তড়পায়, ছটফট করে, তেমনিভাবে আল্লাহর অবাধ্য হলে বান্দার ততটুকুই পেরেশান হওয়া উচিত। হারানো সন্তান ফিরে পাওয়ার জন্য মা যতটুকু পেরেশানীর সাথে অপেক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলাও গোনাহগার বান্দার তওবার মাধ্যমে ফিরে আসার জন্য আরও বেশি অপেক্ষায় থাকেন। প্রিয়জন হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন প্রতি মুহূর্তে তার ফিরে আসার জন্য পথ চেয়ে থাকে। মা সন্তানের শোকে রাতে ঘুমায় না। স্ত্রী স্বামীর অপেক্ষায় নির্ঘুম রাত পার করে। মা ভাবে, এই বুঝি আমার কলিজার টুকরা সন্তান এসে পড়ল। মনে হয় যেনো সন্তান তাকে ডাকছে। তার পায়ের আওয়াজ কানে আসছে। এর চেয়ে বেশি আল্লাহপাক অবাধ্য বান্দার জন্য অপেক্ষা করেন। আসো আমার বান্দা! তোমার জন্য আমার রহমতের দরজা খোলা। ফিরে এসো। আমার ক্ষমার দৃষ্টান্ত অনেক বড়। তুমি শুদ্ধ হয়ে এসো। তওবা করো, এর পর দেখো, তোমার আমার সম্পর্ক কেমন হয়। সবার সাথে তো সম্পর্ক করে দেখেছো। এবার আমার সাথে সম্পর্ক করে দেখো। কত রঙীন রঙেইতো

জীবনকে সাজিয়েছো। এবার নবীর আদর্শে জীবনকে সাজাও; দেখো কেমন লাগে।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যে আমার দিকে আসলো, আমি আগে বেড়ে তার সাথে মিলিত হবো। এমন নয় যে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার দিক থেকে দশবার মুখ ফিরিয়ে নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার খুব নিকটে গিয়ে তার কাঁধ ধরে ডাকি, হে আমার বান্দা! কোথায় যাচ্ছো?

কোরআনে এরশাদ হচ্ছে,

يَاۤ اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

হে মানুষ! কে তোমাকে তোমার মহান পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো। (ইনফিতার– ৬)

কেনো তুমি তোমার পালনকর্তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছো? আল্লাহকে ফেলে মানুষের গোলামী কবুল করেছো?

চোখের পানির মূল্য

ঈমানদার নারী যখন সেজদার জন্য মাথা জমিনে ঠেকায়, ঈমানদার পুরুষ যখন সেজদার জন্য মাথা জমিনে রাখে এবং তার চোখ থেকে ফোটা ফোটা পানি যখন জমিনে পড়ে, এতে জমিন সিক্ত হয়, চল্লিশ দিনের বৃষ্টিও জমিনকে এতটুকু শীতল করতে পারে না, যতটুকু বান্দা তার অনুতাপের অশ্রু দিয়ে জমিনকে সিক্ত করে। চল্লিশ দিনের বৃষ্টিতে জমিনের দশহাত গভীরে পানি পৌঁছে। আর বান্দার অনুতাপের অশ্রু পাতাল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সিক্ত করে।

অথচ এ জমিন আজ তড়পাচ্ছে, কাঁদছে। আল্লাহর বান্দাগন গভীর রজনীতে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অনুতপ্ত হৃদয়ে চোখের অশ্রু ফেলে না, জমিনও সিক্ত হয়না। জমিনের অন্তর ফেটে যাচ্ছে। ঘৃনায়, রাগে, ক্ষোভে। এজন্য যে এ জমিনের উপর অনেক পরিমাণে গান গাওয়া হয়েছে। এ জমিনের উপর খুব বেশি পরিমাণে নৃত্য করা হচ্ছে। তার উপর এতো বেশি পরিমাণে যিনা করা হচ্ছে যে, যমিন ধ্বসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তার উপর এত বেশি পরিমাণ পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানে ভরে গেছে যে, পাহাড়গুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হওয়ার

জন্য প্রস্তুত। এ জমিনের উপর এমন সব জঘন্য পাপ সংগঠিত হচ্ছে যে, আসমান ভেঙ্গে পড়তে প্রস্তুত হয়ে আছে।

প্রিয় বোনেরা! আমি আপনাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, সমস্ত পাপ থেকে ফিরে আসুন। এই জমিনকে আবাদ করতে হবে। এটা সেজদার জায়গা, নাচ গানের জায়গা নয়। আজ এমন কোনো বিবাহের অনুষ্ঠান নেই, যেখানে নাচ গানের অনুষ্ঠান হয় না। ছেলে মেয়ে নাচছে। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করছে। এগুলো না হলে এখন বিয়েতে জৌলুস আসে না। অথচ আমরা মুসলমান। কেউ হাজী সাহেব। কেউ হাজি সাহেবের স্ত্রী। কেউ মসজিদের মুতাওয়াল্লীর বউ, কেউ কন্যা।

একদিকে হিন্দুদের সাথে দুশমনি। জানের দুশমন; অথচ তাদের এইসব মন্দ রেওয়াজগুলো আমরা পালন করছি।

আমাদের রসম রেওয়াজ কুসংস্কার পরিহার করতে হবে। আজকাল তো দেখা যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী, এমনকি তাহাজ্জুদ গুজার লোকের ঘরেও বিজাতীয় রেওয়াজগুলো কত যত্নের সাথে পালিত হয়। বিদ'আত করা হয়।

বিয়ের অনুষ্ঠানে হিন্দুয়ানী রেওয়াজগুলো পালন করে আমরা কোন মুখে হিন্দুদের সাথে জিহাদের কথা বলি। এই গায়ে হলুদ; পান চিনি অনুষ্ঠন কি কোনো মুসলমানের আবিষ্কার? না- এগুলো হিন্দুদের রেওয়াজ। কাফেরদের আচার অনুষ্ঠান সংস্কৃতিকে লালন পালন করা মুসলমানদের সাজে না।

হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর বিয়ে

হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর বিবাহ কিভাবে হয়েছিল? হযরত ফাতেমা কে ছিলেন?

জগতের শ্রেষ্ঠ কন্যা।

সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নারী।

আল্লাহর রাসূলের কলিজার টুকরা। হৃদয়ের অংশ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফাতেমা আমার হৃদয়ের অংশ যে ফাতেমাকে কষ্ট দিলো, সে আমাকে কষ্ট দিলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদের জন্য রওয়ানা দিতেন। একে একে সব ক'জন স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতেন। হযরত ফাতেমার সাথে দেখা করতেন সবার শেষে।

যখন ফিরে আসতেন, তখন সর্বপ্রথম দেখা করতেন হযরত ফাতেমার সাথে, কেনো? ফাতেমার সাথে বিরহের সময়টা যেন কম হয়।

যে নারী নিজে জান্নাতী মহিলাদের সর্দার।

যার দুই পুত্র হযরত হাসান, হুসাইন (রাযি.)। জান্নাতী যুবকদের সর্দার। তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানটির কথা চিন্তা করুন। সে বিয়েতে যদি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে প্রমাণ দিন। যদি মেহেদী উৎসব, গান-বাজনা হয়ে থাকে তাহলে প্রমাণ নিয়ে আসুন।

আজকের সামাজিক অবস্থাটা আমরা এমন করে ফেলেছি যে, বিয়ে-শাদীতে এসব গায়ে হলুদ, গান-বাজনার অনুষ্ঠান না করলে মনে করি যে হায় আমার ইজ্জত গেলো। হায় আমার নাক কান কাটা গেলো।

আসুন! আমরা সেই সমাজকে বদলে ফেলি। নিজেরা পরিবর্তন হই। যে সামাজিক পরিবেশে রাসূল সা: এর ইজ্জতকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। সেই সমাজের অনুসরণ করা মুসলমানের সাজে না। নিজের সাথে কতবড় অবিচার। এসব রেওয়াজ কেউ পালন করছে জেনে, সমাজিকতা রক্ষার ভয়ে। কেউ না জেনে।

প্রিয় বোনেরা!

আজ বিয়েতে আমরা পাত্রের যোগ্যতা বলতে যা যা জানতে চাই, তা হলো, ছেলেটি কি করে? এটা দেখি না ছেলেটা কেমন? তার চরিত্র কেমন? আচরণ কেমন? দ্বীনদার কিনা? অথচ এ দ্বীনদারীটাই হওয়া উচিত ছিল পাত্র-পাত্রীর যোগ্যতার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি।

জিজ্ঞেস করি ছেলে কি করে?

উত্তর যদি এমন হয়,

উচ্চ পদস্থ সরকারী চাকুরী করে বা বড় ব্যবসায়ী। কারখানার মালিক। তাহলে বলি ব্যাস ঠিক আছে, ছেলের যোগ্যতা আছে। এখানে সম্বন্ধ হতে পারে।

আরে! মেয়েরা তো অর্থ-সম্পদ দ্বারা জীবন যাপন করে না, মেয়েরা জীবন-যাপন করে চরিত্র দ্বারা।

কোটি কোটি টাকার মালিকদের প্রাইভেট বাংলোয় গিয়ে কান পেতে শোনো। শুনবে সেসব অট্টালিকার দরজা জানালাগুলোও কাঁদছে, কারণ, সেখানকার বাসিন্দারা দ্বীন শিখেনি। কড়ি কড়ি টাকার কাছে বিয়ে দিয়েছিলো পিতা-মাতা। সেই অর্থ-বিত্ত কন্যার সুখ দিতে পারেনি। চরিত্রহীনতা আর লাম্পট্যের শীতল আগুনে সংসারটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। অর্থ বৈভব জীবনে সুখ দিতে পারে না। যদি উত্তম চরিত্র না থাকে। জীবনের সুখ আসে উত্তম চরিত্রের পথ ধরে। উদাহরণ দিতে গিয়ে কথাগুলো এসে গেলো। এবার মূল ঘটনায় ফিরা যাক।

সে উপমাময় বিবাহ

পাত্র হযরত আলী (রাযি.)। এমন অবস্থা হযরত আলী (রাযি.)-এর; নিজের থাকার ঘরও নেই। বিবাহ হচ্ছে মসজিদে নববীতে। বিবাহ পড়াচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং।

বিবাহ হলো, দু'মাস পর হযরত আলী (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বিবাহতো হলো, এখন কন্যা দান পর্বটা সেরে ফেলা দরকার। আপনি একটা সময় বলে দিন, আমি এসে ফাতেমাকে নিয়ে যাব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেশ সুন্দর কথা, আমি তোমাকে সময় বলে দেবো।

শশুর আর জামাতার মধ্যে আলাপটা হয়েছিলো যোহর কিংবা আসরের সময়।

সেদিনই মাগরিব বাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে গিয়ে উম্মে আয়মনকে ডাকলেন। হযরত ফাতেমা (রাযি.) বলেন, সংসারের মেয়েরা যেরূপ ঘরের কাজকর্ম করে, আমিও অনুরূপভাবে ঘরে এটা ওটা করছিলাম, আমার কল্পনায়ও ছিল না একটু পর কি ঘটতে যাচ্ছে।

উম্মে আয়মন এসে উপস্থিত হলেন।

উম্মে আয়মনের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মা জননী আমেনার দাসী ছিলো। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, কেউ যদি জান্নাতী নারীকে বিয়ে করতে চাও, তাহলে উম্মে আয়মনকে বিয়ে করো। কেউ যদি জান্নাতী মহিলা দেখতে চাও, তাহলে উম্মে আয়মনকে দেখো।)

উম্মে আয়মন এসে উপস্থিত হলেন।

হযরত ফাতেমা বলেন, হঠাৎ আমি বিস্মিত হয়ে পড়লাম। যখন আমার কানে শব্দ এলো। উম্মে আয়মান, ফাতেমাকে আলীর ঘরে দিয়ে আসো।

দেখুন প্রিয় বোনেরা!

দুনিয়া ও আখেরাত দুই জগতের সরদারের কন্যার বিয়ে হচ্ছে।

না আছে বরযাত্রী।

না গান আছে, না বাদ্য যন্ত্র। না নর্তকীর নাচ। না আছে পালকি। কিছুই নেই।

না সামনে কেউ আছে, না কেউ পেছনে।

আল্লাহর প্রিয় হাবীবের কন্যা পরিধানের পোশাকটাও পরিবর্তন করলেন না। পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হলেন।

অথচ এখনকার বিবাহ শাদীতে মানুষ মেয়েদের জন্য লাখ লাখ টাকা মূল্যের পোষাক তৈরি করায়। এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, এক বড়লোকের মেয়ের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় তৈরি হয়েছিল; কিন্তু এরপরও মানুষ বলাবলি করছে, দামটা কম হয়ে গেছে। আরও দামি কাপড় হলে ভালো হতো।

শুনে আমি বললাম, আরে জালেম! আল্লাহর দরবারে কোন মুখে যাবি? কি জবাব দিবি? এই পঞ্চাশ হাজার টাকায় পাঁচটি গরিব মেয়ের বিবাহ হতে পারত। ধনীরা বিলাসিতা করে গরীবদের হক নষ্ট করছে। গরীব মেয়েদের হক নষ্ট করছে।

আর দেখুন, দু'জাহানের সরদারের কন্যা ফাতেমা (রাযি.) পরিধানের কাপড়টিও পরিবর্তন করলেন না। যে পোষাকে কাজ করছিলেন, সে পোষাকেই বিদায় হয়ে গেলেন। তাও পায়ে হেঁটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যার পিতা হিসেবেও সাথে গেলেন না। তিনি এমনটি কেন করলেন? তিনি কি সাথে যেতে পারতেন না? তিনি কি বনু হাশেমকে ডেকে একত্রিত করতে পারতেন না? তিনি কি সব সাহাবীদের ডেকে বলতে পারতেন না? হে সাহাবীরা! তোমরা আসো, আমার কন্যা ফাতেমার বিয়ে হচ্ছে। এ সবই হতে পারত।

কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করলেন না।

এই জন্য করলেননা, যাতে উম্মতের গরীব মেয়েদের সহজে বিয়ে হয়ে যায়। কেউ যেনো বলতে না পারে, গান বাদ্য, গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হলো না বলে আমার নাক কাটা গেলো। এমন নাক কেটে ফেলো যে নাক নবীর আদর্শকে বেইজ্জতী করে।

উম্মে আয়মনকে সাথে দিয়ে হযরত ফাতেমাকে হযরত আলীর বাড়ির উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। আর বলে দিলেন, আলিকে বলো, আমি এশার পর আসব।

উম্মে আয়মন ফাতেমাকে নিয়ে আলীর ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, দরজায় করাঘাত করলেন। হযরত আলী (রাযি.) দরজা খুলে তো তাজ্জব বনে গেলেন! একি হলো?

উম্মে আয়মন বললেন, আপনার আমানত বুঝে নিন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়ে তাশরীফ আনবেন।

এশার নামাজের পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)-এর বাড়িতে গেলেন। এক পেয়ালা পানি চেয়ে নিয়ে তাতে ফু দিলেন। কন্যা, জামাতা দুজনকে সম্মুখে দাড় করিয়ে, হাতে করে সেই পানি তাদের বুকে ও পিঠে ছিটিয়ে দিলেন।

এরপর বললেন, যাও, আল্লাহ তা'আলাা বরকত দান করুন।

প্রিয় বোনেরা! এই বিয়ের অনুষ্ঠান আমাদের কি শিক্ষা দিলো? আজ আমরা সহজ এই ইবাদতটাকে কঠিন করে ফেলেছি। আজ যার ঘরে উপযুক্ত কন্যা আছে, সম্পদ নেই, তার জন্য মহা মুছিবত। লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। এই অবাঞ্ছিত রেওয়াজ আর কুসংস্কারগুলো আমরা যদি ত্যাগ করতে পারতাম, তাহলে আমাদের বিবাহ শাদীগুলো এত পেরেশানির কারণ হতো না।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)

আল্লাহ তা'আলাার এক বান্দি, হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)। রাতে গোসল সেরে পোষাক পরিবর্তন করে গায়ে সুগন্ধি মেখে স্বামীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, আমাকে আপনার কোনো প্রয়োজন আছে কি? স্বামী যদি বলতেন না কোনো প্রয়োজন নেই, তাহলে বলতেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমার কাজ করার।

স্বামী বলতেন, ঠিক আছে, যাও।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) জায়নামাজে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করে দিতেন। সারা রাত নামায পড়তেন। জিকির করতেন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করতেন। রাত ভোর হয়ে যেতো। ফজরের আযান শুনতেন জায়নামাজে বসে।

তখন রাবেয়া বসরির বয়স বেশি হয়নি। স্বামী মারা গেলেন।

তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ একজন বুযুর্গ শুনেছিলেন, হযরত রাবেয়া বসরীর যুহুদ ও তাক্বওয়ার কথা। তিনি রাবেয়া বসরীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন।

এতবড় একজন আবেদ। এত বড় একজন বুযুর্গ, তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ওলি। তিনি নিজেই এলেন হযরত রাবেয়া বসরীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। বিয়ের জন্য মেয়েদের রূপ-সৌন্দর্য দেখা হয়। বংশ দেখা হয়, হযরত রাবেয়া বসরীর কিছুই ছিল না। না রূপ সৌন্দর্য, না ভালো বংশ, তিনি কুশ্রী ছিলেন। অর্থ-সম্পদও ছিল না। তাও আবার দাসী ছিলেন।

তাহলে কি ছিল হযরত রাবেয়া বসরীর যোগ্যতা?

হৃদয়টা তার ছিল এমন স্বর্ণালী ও সুন্দর। আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দি ছিলেন। যুহুদ, তাক্বওয়া ছিল। আল্লাহ পাকের জন্য জীবন উজাড় করে দিয়েছিলেন। এজন্য হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষের কাছে অমর হয়ে আছেন।

ইতিহাস এই কালো মহিলাকে আপন পাতায় জায়গা দিয়েছে। অথচ কত বড় বড় রাজা বাদশাহরও আজ নাম নিশানা পর্যন্ত নেই। কারও হয়েছে অল্প করে, ইতিহাস তাদের কথা দু'চার লাইন লিখেই সামনের দিকে চলে গেছে।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) কে ইতিহাস অনেক জায়গা দিয়েছে। অথচ তিনি রাণীও ছিলেন না, না রাজকন্যা ছিলেন।

কিন্তু আল্লাহর দরবারে সফল নারী।

সেই বুযুর্গ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন, রাবেয়া বসরী পর্দার আড়ালে বসে আছেন।

সেই বুযুর্গের প্রস্তাব শুনে বললেন, যদি আমার চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তাহলে আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবো।

সেই বুযুর্গ বললেন, আপনার প্রশ্নগুলো বলুন। রাবেয়া বসরী (রহ.) বললেন, বলুনতো আমার জন্য জান্নাত নাকি জাহান্নাম?

বুযুর্গ এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। নীরব রইলেন।

হযরত রাবেয়া বসরী এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটি করলেন। বলুনতো, যখন আমলনামা বিতরণ করা হবে, তখন কারও আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। কারও আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। আমার আমলনামা কোন হাতে দেওয়া হবে?

বুযুর্গ এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিতে পারলেন না, নিরব থাকলেন।

রাবেয়া বসরী এবার তৃতীয় প্রশ্ন করলেন, আমার আমলনামা যখন ওজন করা হবে, তখন নেকের পাল্লা ভারী হবে, নাকি বদের পাল্লা ভারী হবে?

বুযুর্গের কাছে এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই।

শেষ প্রশ্নটি এবার রাবেয়া বসরী (রহ.) সেই বুযুর্গকে করলেন। বলুনতো, আমি কি পুলসিরাত পার হতে পারব, নাকি নিচে পড়ে যাবো?

বুযুর্গ বললেন, রাবেয়া! এ প্রশ্নগুলোর একটিরও কোনো জবাব আমার কাছে নেই।

রাবেয়া বসরী বললেন, তাহলে আমাকে প্রস্তুতি নিতে দিন। এ প্রশ্নের জবাবগুলোর জন্য আমি এত ব্যস্ত যে, বিয়ে করার মতো সময় আমার হাতে নেই। আপনি চলে যান।

প্রিয় বোনেরা! যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলাও তার হয়ে যান। আল্লাহ তার জন্য কুদরতীভাবে সব ব্যবস্থা করে দেন।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)-এর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পূর্ণাঙ্গ ছিলো। তিনি আল্লাহর হয়ে গিয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলাও তার হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তার প্রয়োজনাদির ব্যবস্থা করেছিলেন।

আবু বকর ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত রাবেয়া বসরীর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাবেয়া বসরী রান্না করতে গেলেন, দেখলেন পেঁয়াজ নেই। ভাবতে লাগলেন, পেঁয়াজ কোথায় পাব? এমন সময় একটি চিল উড়ে যেতে লাগল,তার পাঞ্জায় পেঁয়াজ ছিল। চিলের পাঞ্জাটি ঢিলা হয়ে একটি পেয়াজ সোজা রাবেয়া বসরীর ঘরে পড়ল।

দেখুন! রাবেয়া বসরির যুহুদ ও তাক্ওয়া। আল্লাহর প্রিয় হয়ে আজও পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন।

সন্তানকে চরিত্রবান বানান

প্রিয় বোনেরা! চরিত্র এমন একটি বিষয়, সেটার প্রয়োজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি। চরিত্র যদি না থাকে তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই বরবাদ। উত্তম চরিত্রের অভাবেই আজ সমাজে এতো অশান্তি। ঘরে শান্তি নেই, রাস্তায় শান্তি নেই, হাটে বাজারে, মাঠে, ঘাটে, যানবাহনে, স্কুল কলেজে সব স্থানে এতো অশান্তি কেনো? শুধু উত্তম চরিত্রের অভাবে। আর উত্তম চরিত্র অর্জন হবে কিভাবে?

ঈমানকে খাঁটি করতে হবে। ঈমান খাঁটি হলে চরিত্র উত্তম হয়ে যাবে।

পিতা-মাতা যদি ঈমানদার চরিত্রবান হয়, তাহলে সে পিতা-মাতা সন্তানকে ছোট বেলা থেকেই উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেবে। এ কাজটি আজকের দিনে কেউ করছে না।

মা সন্তানকে চরিত্র শেখায় না।

বাবা সন্তানকে চরিত্র শেখায় না।

ছেলেকেও না, মেয়েকেও না।

বরং শূন্য হাতে মেয়েকে শশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

মা-বলে, আমি আমার মেয়েকে সবকিছু দিয়েছি, যত যা দরকার সব দিয়েছি।

দামী ফার্নিচার দিয়ে দুলহার ঘর ভরে দিয়েছি।

স্বর্ণের অলংকার দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাজিয়ে দিয়েছি। এই সেই কত কিছু দিয়েছি।

আমি যখনই মহিলাদের কোনো মাহফিলে বয়ান করি, একটি প্রশ্ন করি। আপনার মেয়েকে আপনি সব কিছু দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহকে দেননি। নাকি দিয়েছেন?

আপনি আপনার কন্যার হাত দু'টি স্বর্ণ-রূপার চুড়ি দ্বারা ভরে দিয়েছেন।

কান দুটোকে সাজিয়েছেন দুল দ্বারা।

মাথাকে সাজিয়েছেন টিকলি দ্বারা।

গলাটাকে সাজিয়েছেন, হার নেকলেস দ্বারা।

পা দু'টিকে সাজিয়েছেন নুপুর দ্বারা।

শরীরটাকে সাজিয়েছেন সিল্কের শাড়ি দ্বারা।

কিন্তু তার হৃদয়টাকে কেন সাজাননি আল্লাহ তা'আলার প্রেম দ্বারা?

এই যে শূন্য পাত্র বানিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন, সারাটা জীবন সে স্বামীর ঘরের দায়িত্ব কিভাবে পালন করবে? যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক তৈরি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনে সুখ কিভাবে আসবে?

আপনিতো তাকে নতুন এক পরিবেশে পরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানে তো সে কন্যা হয়ে নয়, বউ হয়ে যাচ্ছে।

যখন ওর জীবনে কোনো বিপদ আসবে, তখনতো আপনার মাথা খাবে, নাকি আল্লাহকে স্মরণ করবে?

তাই বলছি, মেয়েকে আগে ঈমান শিখানও। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরী করে দিন। এরপর বিয়ে দিন।

অলংকার দিয়েছেন?

পোষাক দিয়েছেন?

আরও যত কিছু দিয়েছেন,

আল্লাহর কসম, যদি আপনি তাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের শিক্ষা না দিয়ে থাকেন, ঈমান না শিখিয়ে থাকেন, তাহলে তাকে আপনি কিছুই দেননি।

একটি মেয়ের বিয়ের বয়স হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতার ঘরে কাটায়। কিন্তু যদি পিতা-মাতা তাকে আল্লাহর সামনে কাঁদতে শিখাল না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে শিখাল না। এর অর্থ হলো তারা মেয়েটিকে শূন্য হাতে পাঠিয়ে দিল।

বিয়ের পর যদি কোনো মেয়ে স্বামীর বাড়িতে খালি অবস্থায় যায়।

হাত দুটো খালি।

কান খালি,

নাক খালি,

মাথা খালি,

খালি গলাও,

তাহলে এলাকায় ছিঃ ছিঃ আওয়াজ উঠবে। আরে মুর্খ নাদান! মেয়েটির নাকে একটি কাঁটাও তো পরিয়ে দিলে পারতি। কিন্তু আমি আমার রবের কসম খেয়ে বলছি, যদি কোনো মেয়ে সমস্ত শরীরে

অলংকারের বোঝা নিয়েও রওয়ানা হয়, আর তার হৃদয় আল্লাহ প্রেমের অলংকার শূন্য থাকে, তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, ওহে কপাল পোড়া উম্মত! মেয়েটিকে তুই শূন্য হৃদয়ে বিদায় করে দিলি।

আল্লাহর সম্পর্কও দিলি না, আমার সম্পর্কও দিলি না। কাল যখন সে সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন তো নিজের রবকে স্মরণ করবে না।

বিয়ে হয় কত আনন্দ ফুর্তি করে। মাস যায় না, ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে সম্মান করে না। কেউ ছোট হতে রাজি নয়।

এমনটা কেন হয় জানেন?

কারণ হলো,

স্ত্রী জানে না তার সীমানা কতটুকু।

স্বামী জানে না তার সীমানা কতটুকু।

শাশুড়ি জানে না তার সীমানা।

শশুর জানে না, তার সীমানা।

কেউ চরিত্র শিখেনি, আল্লাহর রাসূল সাঃ এর তরীকা শিখেনি। কন্যাকে পিতা-মাতা নবীর তরীকা শিক্ষা দেয়নি। ছেলেকে পিতা-মাতা নবীর তরীকা শিক্ষা দেয়নি। নবীওয়ালা তীরকা, ঈমান আর উত্তম চরিত্র না শিখার কারণে আজ সব স্থানে এ সংঘাত।

তাই আমি আবারও বলছি, মায়েরা বোনেরা, ইহুদী নাসারাদের মতো জীবন যাপন করবেন না। আজকের নারীরা পাশ্চাত্যের নারীদের দিকে ঝুঁকছে। তাদের অনুকরণ অনুসরণ করছে। পোষাক-আশাকে চাল-চলনে ইহুদী নাসারাদের ছাপ পড়েছে। যা মুসলমান নারীর জন্য শোভনীয় নয়।

তাই আমার আহ্বান, আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আপনারা হযরত ফাতেমার মতো নারী হয়ে উঠুন। আপনারা হযরত খাদিজা (রাযি.)-এর মতো হয়ে উঠুন।

আমি আপনাদেরকে খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর বেটি বানাতে চাই। আপনারা তাঁর তরীকা মতো চলুন। যাতে রোজ কেয়ামতে খাতুনে জান্নাতের সাথে উঠতে পারেন।

আল্লাহ না করুন, এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন যখন বলবেন, পাশ্চাত্যের নারীরা আলাদা হয়ে যাও।

তখন যদি আপনারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান! সারা জীবন মুসলিম পরিচয়ে জীবন কাটালেন, আর হাশর মাঠে পশ্চিমা বেহায়া নারীদের অনুসরণের কারণে ফেরেশতাগণ যখন টেনে আপনাকে তাদের সাথে দাঁড় করিয়ে দিবে, তখন কি করবেন? সেদিন ফেরেশতাগণ মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। মহিলারা বলতে থাকবে, আমাদের উপর রহম করো। ফেরেশতাগণ বলবেন, আল্লাহ তা'আলা রহম করেন নি, আমরা কিভাবে রহম করবো?

প্রিয় বোনেরা!

আল্লাহ তা'আলাকে আপন করে নিন, তিনিও আপন করে নিবেন। আল্লাহ আমাদের যে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন, সে কাজ করে তাঁকে রাজি-খুশী করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

বান্দা! তুমি আমাকে রাজি করে কবরে আসো।

আমার প্রিয় হয়ে কবরে আসো।

আমার আদেশ নিষেধকে পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করে কবরে আসো। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকায় নিজেকে তৈরি করে কবরে আসো। তাহলেই তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাতেই সফলতা আসবে।

যে দিন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষ আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলাা জিজ্ঞেস করবেন,

আমার বান্দা-বান্দী! বলো আজ কি কি নিয়ে এসেছো?

আমার দরবারে কি নিয়ে হাজির হয়েছো?

তখন আমি কি জবাব দিবো? তখন লজ্জিত হতে হবে।

পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে

আমি দুনিয়ার মুসলিম মহিলাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা:) এর পথে ডাকছি। তোমরা যাচ্ছো পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে। তোমরা শালীন পোষাককে বিদায় দিচ্ছো। পর্দার তোয়াক্কা করছ না, বেপর্দার বাজার খুলে বসেছো। হায়! হায়! কোথায় যাচ্ছো নারীরা। তোমরা খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাযি.)-এর দল ছেড়ে কোন জাহান্নামের পথ ধরেছো?

তোমরা পাপের পথ ধরেছো। রাবেয়া বসরীর যুহুদ ও তাক্বওয়াকে বিসর্জন দিয়েছো। অন্তরকে এলাহী নূর থেকে শূন্য করছো। টিভি আর ইন্টারনেট নিয়ে বসেছো। নামায বরবাদ হচ্ছে। যোহর যাচ্ছে, আসর যাচ্ছে, মাগরিব যাচ্ছে, ইশাও যাচ্ছে। খবর নেই। ঘুমিয়ে ফজরও বরবাদ করছো।

প্রিয় বোন আমার! এসব কি করছো? নিজ হাতে নিজের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিও না। যে আগুন, তুমি জ্বালিয়েছো আলোর জন্য। অসাবধানতায় বেখেয়ালে যদি আগুন লাগে, তবে তাতে ভাগ্যের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তোমার অসাবধানতায়, আগুন লেগেছে। এজন্য তুমি দায়ী। তোমার অসাবধানতা দায়ী, তুমি সাবধান হলে এ দুর্ঘটনা ঘটতনা।

তেমনিভাবে আজ তোমার অসাবধানতায় তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে। হুঁশে আসো। নিজ হাতে জাহান্নামের আগুনে নিজের ঠিকানা বানিও না।

আজ এ মাহফিলে হাজার হাজার নারী বসে আছে। সবাইকে বলছি, আমার একটাই আরজ। তোমরা যখন আজ এখান থেকে উঠবে; তখন হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর বেটি হয়ে উঠবে। যখন এখান থেকে উঠবে, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুগত উম্মত হয়ে উঠবে। তওবা করে যাও। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকায় আসো। যেখানে সম্মান আছে, সফলতা আছে, সুখ-শান্তি আছে।

তোমরা পাশ্চাত্য নারীদের অনুকরণ করো না

প্রিয় বোনেরা!

তোমরা কেন পাশ্চাত্য ইহুদী খৃষ্টান নারীদেরকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করছো? তোমরা তো মুসলমানের সন্তান। তাহলে তোমরা কেনো বিজাতীয়, পাশ্চাত্যের নারীদের মতো হতে চাও?

যারা নারীকে মা হিসেবে মর্যাদা দিতে জানে না, বোন হিসেবে নারীকে মর্যাদা দিতে জানে না। স্ত্রী হিসেবেও নারী মর্যাদা পায় না। দাদী নানী হিসেবেও মর্যাদা পায় না।

শুধু একটি পরিচয়েই পরিচিত, তা হলো প্রেমিক। শয্যা সঙ্গীনী যতক্ষণ পর্যন্ত নারীর রূপ যৌবন থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের মূল্য আছে। রূপ যৌবন যখন শেষ হলো, তখন বাতিল পুতুলের মত ছুড়ে ফেলে দেয়। এইসব দেশের নারীদের রূপ ছিল। যৌবন ছিল। তখন তাদের স্বাধীনতাও ছিল। মূল্যও ছিল।

রূপ যৌবন যখন ভাটা পড়েছে তখন ছুড়ে ফেলে দিলো।

এটা হলো সমান অধিকারের বিষ ফল।

হে মুসলিম নারী! নিজেকে সামলাও। দুনিয়ার এ সামান্য সুখের জন্য নিজের লোভ লালসাকে সীমা অতিক্রম করিও না, লজ্জাশীলতার চাদর পরো। নিজের ইজ্জত আব্রুকে হেফাজত করো।

কাল কেয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউজে কাওসারের পারে দাঁড়িয়ে বলবেন, এসো আমার কন্যারা, আমার হাতে পান করো, আমি তোমাদের লজ্জাশীলতাকে সালাম করি। যখন ইহুদী নাসারাদের অনুকরণে আমার উম্মতের কিছু নারী সে পথে মিশে ছিলো, বেপর্দা হয়ে বাজারে বন্দরে চলা ফেরা করতো এবং সেটাকে তারা মনে করতো স্বাধীনতা, তোমরা সে সময় পর্দার সাথে ছিলে, ইজ্জত আব্রুকে হেফাজত করেছো। তোমরা এসো, আমার কন্যা ফাতেমার সাথে তোমরা দাঁড়িয়ে যাও।

সেটি কেমন দিন হবে? যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের এমন পবিত্র নারীদেরকে সম্মানিত করবেন?

তাই বলছি বোনেরা! দিক বদলাও। লাইন ঠিক করতে হবে। অবৈধ প্রেম ভালোবাসার স্বাদ কয় দিনের? এরপর কি হবে? শেষে তো একদিন সব ছেড়েই চলে যেতে হবে। শেষ বারের মতো জানাজা কাঁধে উঠে যাবে। শেষে এক সময়তো কবরের চিহ্নও থাকবেনা।

পেটের সন্তানও একদিন চিনতে পারবে না মায়ের কবর কোথায় ছিলো।

তাই বলছি, মা ও বোনেরা!

নিজের ঘরকে নামাজ দ্বারা জিন্দা করে তুলুন।

জিকির ও তেলাওয়াত দ্বারা অন্তরকে সতেজ করুন।

স্বামী-স্ত্রীর হক আদায় করবে। স্ত্রী-স্বামীর হক আদায় করবে।

পিতা-মাতা সন্তানের আচরণ সুন্দর করে গড়ে তুলবে।

সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না।

নিজের সন্তানকে হালাল খাওয়ান, কখনোও হারাম খাওয়াবেন না। নিজের জীবন থেকে শরীয়ত বিরোধী কাজগুলো বিদায় করে দিন।

পর্দায় থাকুন।

পর্দার সাথে চলুন।

বোনেরা! তোমরা বাজারে যাবে কেনো? বাজার তো মন্দ জায়গা। তুমি পর্দায় থাকবে। তুমি মূল্যবান। তোমার মূল্য কত তা বুঝতে চেষ্টা করো। তুমিতো সুরক্ষিত থাকবে অন্দর মহলে। তুমি নারী যদি পেট খুলে চলাফেরা করো, তাহলে সে পেট শত শত পুরুষ দেখবে। এ পেটতো হলো তোমার সন্তানের জন্মস্থল, পাপী সে পেট থেকে কি আব্দুল কাদের জিলানী আর বায়েজীদ বোস্তামীর মত অলি পয়দা হবে?

জোনায়েদ বোগদাদীর মাও তো তোমাদের মতো নারীই ছিলেন। সব অলি গাউস, কুতুব যেসব মায়েরা জন্ম দিয়েছেন, তারা ছিলেন নেককার আবেদা নারী। আমি এক মহিলার কথা শুনেছি; সে মহিলা গর্ভবতী হওয়ার পর থেকে দশ মাসে কোরআন দশ খতম দিতেন, পরবর্তীতে দেখা গেছে যে, সে সব সন্তানরা সবাই বড় বড় আলেম হয়েছে।

অথচ আজ মুসলিম নারীদের কি হলো যে, সন্তান পেটে আসার পর তারা টিভির সামনে বসে থাকে। নাচ গানের নেশায় মশগুল থাকে। যোহর যায়, আসর যায়, মাগরিব এশাও চলে যায় টিভির অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে। আর ফজরতো চলে যায় ঘুমের মাঝেই। হায় আল্লাহ! তোমার বান্দিদের রহম করো। তাদের হেদায়েত করো। তাদের সঠিক জ্ঞান দাও।

আজ পিতা-মাতাদের অনাচার আর পাপের কারণে সন্তানরাও নষ্ট হচ্ছে। সন্তান পিতার কথা শোনেনা। মাকে তো পাত্তাই দেয় না। কারণ হলো, পিতা নিজেও জানেনা সন্তানকে সঠিক সুন্দরভাবে মানুষ করার নিয়ম। দ্বীনের তালিম নেই। মা জানেনা ছেলে মেয়েদের সীমানা কতটুকু। কারণ দ্বীনের জ্ঞান নেই।

পাপ পূণ্যের বাছ-বিচার নেই। দ্বীনের চর্চা নেই। তাই আজ পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র এমন অশান্তি। পারিবারিক কলহ। শত শত সংসার অশান্তির আগুনে দাও দাও করে জ্বলছে। সামাজিক শৃঙ্খলা বলতে নেই।

তাই বোনেরা! সুন্দর সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে একজন দ্বীনদার মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। দ্বীনদার মা দ্বীনদার সন্তান উপহার দিতে পারে।

পর্দায় থাকো, পর্দার সাথে চলো

পবিত্র কোরআনে কারীমে মহান রাব্বুল আলামীন নারীদের জন্য একটি আয়াত নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন।

হে নারী! তুমি ঘরের বাইরে বের হও। আল্লাহ তা'আলাা নিষেধ করেননি। বলেননি যে মেয়েরা ঘর থেকে বের হতে পারবে না। কিন্তু বলেছেন, যদি বের হও, তাহলে এমনভাবে বের হও যেমনভাবে হযরত শোয়াইব (আ.)-এর কন্যাগণ বের হয়েছিলেন।

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ (ক্বাসাস-২৫)

হযরত শোয়াইব (আ.)-এর কন্যা এলো, হযরত মূসা (আ.) কে বলার জন্য যে, আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন। যে মেয়েটি এসেছিলেন ডাকার জন্য। পায়ে হেঁটে এসেছিলেন। তাঁর চলায় এমন লজ্জাশীলতার ছাপ ছিলো যে, মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে সে মেয়েটির লজ্জাব্রত চলা এতটাই পছন্দনীয় লাগল যে, আল্লাহ তা'আলাা তাঁকে কোরআনের অংশ বানিয়ে দিলেন। আর বললেন, তোমরা যদি লাজনম্র নারী দেখতে চাও তাহলে তাকে দেখ। লজ্জাশীলতার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

অতএব বের হবে হও; কিন্তু পর্দার সাথে। শালীনভাবে, লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে নয়।

দুনিয়াতে পর্দার সাথে থাকো, জান্নাতে আল্লাহ তা'আলাা সমস্ত পর্দা উঠিয়ে দেবেন। তখন তুমি নারী জান্নাতী হুরের চেয়ে সত্তর হাজার গুণ বেশি রূপসী হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলাা এটা দান করবেন। সে রূপতো হবে চিরস্থায়ী। টেকসই, চির যুবতী, শরীর ভাঙ্গবেনা। চামড়া কুচকাবেনা। আল্লাহ তা'আলাা এইরূপ বান্দার প্রতি খুশী হয়ে দান করবেন। মহান রাব্বুল আলামীনের সে উপহার, যার কোনো তুলনা হয় না।

জান্নাতে মুসলিম নারীর মর্যাদা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জান্নাতের হুর উত্তম না দুনিয়ার নারী উত্তম?

যেহেতু তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মেশকে আম্বর দ্বারা।

জাফরান দ্বারা।

আর দুনিয়ার নারীরা মাটি, পানি আর আগুনের তৈরি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উম্মে সালমা! দুনিয়ার ঈমানদার নারী জান্নাতের হুরদের চেয়ে উত্তম।

হযরত উম্মে সালমা জিজ্ঞসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কি কারণে তারা হুরদের চেয়ে উত্তম?

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

নামাজের জন্য بِصَلٰوتِهِنَّ

وَصِيَامِهِنَّ রোজার কারণে।

وَعِبَادَتِهِنَّ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের কারণে।

وَأَلْبَسَ اللّٰهُ وُجُوْهَهُنَّ النُّوْرَ আল্লাহ তাঁর নুর তাদের চেহারায় ঢেলে দেবেন।

এরপর হুরদের চেয়ে দুনিয়ার ঈমানদার নারীর মর্যাদা বহু গুনে বৃদ্ধি পাবে। এরপর বেহেশতের হুরগণ দুনিয়ার ঈমানদ্বার নারীদের গায়ে রেশমী পোষাক পরিয়ে দিবে।

হাতে বালা পরিয়ে দেওয়া হবে।

স্বর্ণের চিরুনী দ্বারা চুল আচড়াবে।

তাদের মাথার চুল পা পর্যন্ত লম্বা হবে, হুরগণ সে চুল ধরে জান্নাতী নারীর সাথে চলবে।

জান্নাতী নারীদের লেহেংগার আচল তিন মাইল পর্যন্ত লম্বা হবে। আমিতো একইথাটা পড়ার পর ভাবতে লাগলাম যে, তিন মাইল পর্যন্ত লম্বা যে পোষাক হবে এর ওজন কত হবে? এটা উঠাবে কিভাবে? ভাবতে ভাবতে এক সময় বুঝে আসলো যে জান্নাতী পোষাকতো আর সুতার

তৈরি নয়, পলিষ্টার বা টরে কাপড় নয় যে ওজন হবে। বরং জান্নাতী পোশাক হবে নূরের, যে নূরের কোনো ওজন নেই। সেটা তিন মাইল হোক আর তিন শত মাইল হোক। কাপড়ের প্রতিটা জোড়ায় থাকবে বিভিন্ন রঙের সমাহার। প্রত্যেকটা রঙের ঝলক চেহারায় পড়বে, যার দরুন জান্নাতী নারীর চেহারার সৌন্দর্য ঝলক দিতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলাা এ সৌন্দর্য দেবেন উপহার হিসেবে।

আর স্বামীগণ তাদের স্ত্রীদের এমন রূপের ঝলক দেখে একনজরেই চল্লিশ বছর কাটিয়ে দিবে। এরপরও দেখার স্বাদ ফুরাবে না।

প্রিয় বোনেরা! এটাইতো হলো জিন্দেগী। চিরস্থায়ী বাসস্থান। তাই আজ পর্যন্ত যা করেছেন তা থেকে তওবা করুন। সেই জীবনের প্রস্তুতি নিন। এই সারা মজমা তওবা করবে। আমি তো সব বয়ানেই এ আবেদন করি।

বোনেরা! আমি আমার নজরে আপনাদের দেখছি না, এরপরও আপনারা আমার সামনে বসা। এখন সবাই বলেন, ইয়া আল্লাহ! মাফ করো। সমস্ত মাস্তুরাত। সবাই এক সাথে বলুন।

ইয়া আল্লাহ! আমরা আজ পর্যন্ত যত পাপ করেছি, তা থেকে তোমার দরবারে তওবা করছি।

হে আল্লাহ! আমাদের তওবা কবুল করো।আমীন।

মু'মিনের পরিচয়

কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন।

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

নিশ্চই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ, আত্মসমর্পণকারী নারী।

وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী

وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ

অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী।

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ

সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী।

وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ

ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী।

وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعَاتِ

বিনয়াবনত পুরুষ ও বিনয়াবনত নারী।

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ

দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী।

وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمَاتِ

রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী।

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا۔

লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী। আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। (সূরা আহযাব-৩৫)

কামিয়াবীর পথ

এই দশটি কথা, এই দশটি গুণ যদি মুসলমান নারী নিজের মধ্যে তৈরি করতে পারে, তাহলে সে কামিয়াব।

আর যদি এ দশটি গুণ মুসলমান পুরুষ অর্জন করতে পারে সেও কামিয়াব। আল্লাহ তা'আলার দরবারে তারা সফলকাম হিসেবে গণ্য হবে।

সফলতার প্রথম শর্ত ইসলাম

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষ ও ইসলাম গ্রহণকারী নারীগণ।

মুসলমান হওয়া, ঈমানদার হওয়া, এখন কথা হলো ইসলাম কি? ইসলামের কিছু প্রকাশ্য নমুনা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেসালাতের প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস।

নামায, রোজা, হজ্জ যাকাত। এসব বিষয়ের উপর অকুণ্ঠ একীন ও বিশ্বাস এবং তা স্বযত্নে পালন করা।

হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের হাকীকত (মূলতত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

مَا الْاِسْلَامُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

ইসলামের মূল মর্ম কি?

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন।

اَنْ تُسَلِّمَ قَلْبَكَ لِلّٰهِ

তোমার অন্তর আল্লাহ তা'আলার কাছে সপে দিবে।

এটাই হলো ইসলাম।

অর্থাৎ তোমার অন্তরে শুধু আল্লাহ থাকবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপস্থিত অন্তরে থাকতে পারবে না। নারী পুরুষের অন্তর যখন দুনিয়াবী সবকিছু থেকে পবিত্র হয়ে উঠবে। অন্তর একমাত্র আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত হবে, তখনই সে মুসলমান হতে পারবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন,

وَاَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِكَ وَيَدِكَ

তোমার হাত ও মুখ থেকে যেন অন্য সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে।

সফলতার দ্বিতীয় শর্ত

কোরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে,

وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী।

ঈমানের ভিত্তি কি? ভিত্তি হলো আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতাগণ, নবী ও রাসূলগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, আখেরাত এবং তকদীরের উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন।

এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন,

مَا الْاِيْمَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঈমানের মূল মর্ম কি?

اَلصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন

ধৈর্য ও ক্ষমাই হলো ঈমানের মূল মর্ম।

এখানে সামাহাত দ্বারা কেউ কেউ বলেছেন, দানশীলতা বুঝানো হয়েছে। তাহলে মূল মর্ম দাঁড়ায়, ধৈর্য ও দানশীলতা।

সাহাবায়ে কেরামগণ প্রশ্ন করলেন, اَىُّ الْاِيْمَانِ اَفْضَلُ

সবচেয়ে উত্তম ঈমান কি?

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, حُسْنُ الْاَخْلَاقِ

সুন্দর চরিত্রই হলো উত্তম ঈমান।

চরিত্র সুন্দর ঈমান সুন্দর।

প্রিয় বোনেরা! এই পাঞ্জাব একটি শহর। এমন শহর পৃথিবীতে আরও অনেক আছে। সেখানে নারীও আছে। কিন্তু পর্দার রেওয়াজ নেই, নামায নেই। নারীরা বে-দ্বীনের মতো চলাফেরা করে, তবে পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকাগুলোতে আল-হামদুলিল্লাহ নামাযের প্রচলন আছে। পর্দারও প্রচলন আছে।

তবে আজকাল নামাযীর চাইতে বেনামাযীর সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে উত্তম চরিত্র বলতে যে কথা হাদীসে উল্লেখ করা আছে, তার উপস্থিতি এই পাঞ্জাব শহরে নেই। সীমান্ত অঞ্চলে নেই, পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই নেই। অথচ ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয় না উত্তম চরিত্র ছাড়া। আজ পৃথিবীতে লাখ লাখ নারী-পুরুষ খুঁজেও একজন উত্তম চরিত্রের মানুষ পাওয়া দুঃসাধ্যের বিষয়।

আজ মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকট হলো চারিত্রিক সংকট। পূর্ব থেকে পশ্চিমে সাদা-কালো নারী পুরুষ যত আছে, কারও মাঝে চরিত্রের ঝলক নজরে পড়ে না, বরং চরিত্রের পতনই সর্বত্র সুস্পষ্ট। নারী পুরুষ কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। কারও মধ্যে ক্ষমা করা বা ছাড় দেওয়ার প্রেরণা লক্ষ করা যায় না। শুধু যে নিজেরা উত্তম চরিত্রের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তা নয়; বরং সন্তানদের উত্তম চরিত্র গঠন থেকে বঞ্চিত করছে।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানের পূর্ণতার জন্য শর্ত হলো চরিত্রের পূর্ণতা। আর চরিত্রের পূর্ণতা লাভ হয় ধৈর্য ও ক্ষমার দ্বারা। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে ঝগড়া-বিবাদ থেকে শুরু করে খুন-খারাবীসহ সকল অন্যায় ঘটে এই চরিত্রের অপূর্ণতার কারণে।

হাদীসে আছে, হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারের এমন এক নারী সম্পর্কে আলোচনা হলো, যে ছিল খুবই ইবাদত-গুজার। কিন্তু তার চরিত্র ভালো ছিল না। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, সে নারী জাহান্নামে যাবে। এরপরই এমন এক নারীর প্রসঙ্গ আলোচনায় এলো যে, সে খুব বেশি এবাদত করত না, কিন্তু চরিত্র ছিল সুন্দর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, এ নারী জান্নাতে যাবে। সুতরাং আমরা বুঝলাম, ঈমানের পূর্ণতার জন্য উত্তম চরিত্র অপরিহার্য।

সফলতার তৃতীয় শর্ত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ

অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী।

আল্লাহর দরবারে বিনয়াবনত ইবাদতগুজার নারী ও পুরুষ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মু'আযা আদাবিয়াহ নামক এক নারীর কথা। তিনি ছিলেন সে সময়কার বিখ্যাত একজন তাপসী। তাঁর স্বামী আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। স্বামীর শাহাদাতের পর বিশ বছর তিনি পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন, এই বিশ বছরে তাঁর প্রতিটা রাত কেটেছে নামাযের মধ্যে।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাতের বেলায় বিছানায় ঘুমান নি। যখন তাঁর সামনে মৃত্যু এসে হাজির হলো, তখন তিনি হাসছিলেন। উপস্থিত মহিলারা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমার সামনে আমার স্বামীকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলছেন, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তোমাকে অর্ভ্যথান জানাতে এসেছি। এর থেকে আমি এটা অনুমান করতে পারছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের মিলন ঘটাবেন এবং আমাদের নিবাস হবে জান্নাত।

সুতরাং সফলতার ভিত্তি হলো বিনয়ের সাথে একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহর ইবাদত করা।

সফলতার চতুর্থ শর্ত

আল্লাহ তা'আলাা ইরশাদ করেন,

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ

সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোনো মুসলমান কি ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ হতে পারে।

সাহাবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো মুসলমান কি কৃপন হতে পারে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ হতে পারে।

সাহাবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোনো মুসলমান কি মিথ্যা বলতে পারে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, না-কোনো মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না।

মুসলমান নারী-পুরুষ, কখনও মিথ্যা বলতে পারে না।

নারী মিথ্যা বলতে পারবে না- পুরুষ মিথ্যা বলতে পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সতর্কবাণী মনে রাখুন। মুসলমানকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন, চাই সে নারী হোক, বা পুরুষ হোক, শিশু হোক, বা বৃদ্ধ হোক, কিশোর-তরুণ যুবক, কোনো মুসলমানই মিথ্যা বলতে পারবে না।

হায়! আজ আমরা চার দিকে কি দেখতে পাচ্ছি, শুধু মিথ্যা আর মিথ্যা। মিথ্যার প্রতিযোগিতা। এখন তো সুন্দর করে মিথ্যা বলাটাও একটা ফ্যাশন। একটা আর্ট। স্বামী স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বলছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে মিথ্যা বলছে। আর এই দেখে সন্তানরাও মিথ্যার শিক্ষা পাচ্ছে। একটি মিথ্যাকে ঢাকতে গিয়ে শতশত মিথ্যা বলতে হচ্ছে। সারা জীবন মিথ্যার উপরই অতিবাহিত হচ্ছে। এজন্যই আজ মুসলমান সমাজে, পরিবারে, এত অশান্তি। বরকত নেই। রহমত নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, বিশ্বাস নেই। আর এই একমাত্র মিথ্যার কারণে জীবনের সব নেক আমল বরবাদ হচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা ত্যাগ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতে ঘরের ব্যবস্থা করব।

আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করবে, আমি তার জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসে ঘরের ব্যবস্থা করব।

প্রিয় বোনেরা! আমাদের মিথ্যা ছাড়তে হবে। সত্যবাদী হতে হবে। সত্যের উপর অটল থাকতে হবে। সত্য সুন্দর চরিত্রই আমাদের মনজিলে মকসাদে পৌঁছে দিবে।

সফলতার ৫ম শর্ত

وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ

ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করবেন, ধৈর্যশীলগণ দাঁড়াও। আল্লাহ তা'আলাার এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথে ক্ষুদ্র একটি দল দাঁড়িয়ে যাবে। তখন মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করবেন, তোমরা চির শান্তির স্থান জান্নাতে চলে যাও।

এরপর আল্লাহ তা'আলাা তাদের সম্মানে ফেরেশতাদের একটি সু সজ্জিত দল পাঠাবেন, তারা দুনিয়ার ধৈর্যশীল জান্নাতী বান্দাদের সম্মানের সাথে বলবে, ভাই তোমরা কোথায় যাচ্ছো?

তারা জবাব দিবে, আমরা জান্নাতে যাচ্ছি। ফেরেশতাগণ আবার বলবে, হিসাবতো দিয়ে যাবে, তোমাদের হিসাব নিকাশ তো এখনও বাকী।

বান্দাগণ বলবে, আমাদের তো কোনো হিসাব নেই, সব আল্লাহ তা'আলাা মাফ করে দিয়েছেন।

ফেরেশতাগণ বলবেন, তোমাদের পরিচয়টা বলো, তাহলে বুঝতে পারব আল্লাহ তা'আলাা কেনো তোমাদের মাফ করে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। বান্দা বলবে, আমরা দুনিয়ায় কঠিনতম ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়েছি। সেই ধৈর্যশীলতার পুরস্কার আজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের দিয়েছেন।

ফেরেশতাগণ বলবে, মারহাবা, মারহাবা, তোমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তোমাদের জিজ্ঞেস করার কে আছে? এরপর ফেরেশতাগণ তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কোন কোন বিষয়ে ধৈর্যধারণ করেছো?

তারা বলবে, আল্লাহ তা'আলাা দুনিয়াতে আমাদের অভাব দিয়েছিলেন, আমরা সেই কঠিন ক্ষুধার সময়ও ধৈর্যধারণ করে তাঁর এবাদত করেছি। আমরা অভাব অনটনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে ধরে নিয়ে তা গ্রহণ করেছি।

দুনিয়াতে আমরা আল্লাহ তা'আলাার অবাধ্য হওয়ার অনেক সুযোগ পেয়েছি, এরপরও তাঁর নির্দেশ অমান্য করিনি। ধৈর্যের সাথে নিজেকে রক্ষা করেছি।

এরপর ফেরেশতাগণ তাদেরকে জান্নাত দেখিয়ে বলবে, যাও, এই তো তোমাদের চিরস্থায়ী আরামের স্থান। যা তোমরা নেক আমল দ্বারা অর্জন করেছো।

সফলতার ষষ্ঠ শর্ত

وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ

বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী

বিনয় দ্বারা এখানে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। নির্জনে গোপনেও আল্লাহকে ভয় করতে হবে।

যারা নির্জনে আল্লাহকে ভয় করে, তাদের কথা বলা হয়েছে। যেসব নারী-পুরুষ আল্লাহকে সর্বাবস্থায় ভয় করে তাদের কথা বলা হয়েছে।

যারা আল্লাহকে ভয় করে একাকিত্বেও।

আল্লাহকে ভয় করে লোকালয়ে।

আল্লাহকে ভয় করে প্রভাব প্রতিপত্তি থাকার পরও।

যারা আল্লাহকে ভয় করে সুখের দিনে।

আল্লাহকে ভয় করে বিপদের সময়ও।

যে নারী-পুরুষ নিজের খাহেশাতকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর ভয়ে। আল্লাহর ভয় তাদেরকে হারাম পথে পা বাড়াতে দেয় না। আল্লাহর ভয় তাদেরকে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করতে দেয় না। এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে।

মানুষের হৃদয়ে লালিত এ ভয়কেই বিনয়, বিনম্রতা-একাগ্রতা বলে। যদি কারও অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে এই ভয়ই তাকে সব রকমের অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। সহজ হয়ে যায় তার জন্য সফলতার পথ।

সপ্তম শর্ত

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

দানশীল নারী ও দানশীল পুরুষ।

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাজি-খুশীর জন্য তাঁকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর সম্পর্কে বর্ণিত সে ঘটনাটি আমাদের মা বোনদের দান খয়রাত করায় উৎসাহিত করবে।

কতই চমকপ্রদ সে ঘটনা; হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাযি.) হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর খেদমতে এক লক্ষ দেরহাম উপহার পাঠালেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) সেদিন রোযাদার ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) মুদ্রাগুলো হাতে পাওয়ার পর তা মদীনার অসহায় গরীব দুঃখীদের মাঝে বণ্টন করতে শুরু করলেন। আসর পর্যন্ত এক লাখ দিরহাম বণ্টন করা শেষ হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা যখন ইফতারের সময় হলো, তখন সেবিকা এসে বলল, আপনি তো জানেন, আমাদের ঘরে খাবার নেই, যদি একটি দেরহাম রেখে দিতেন, তাহলে বাজার থেকে গোশত এনে আপনার ইফতারের ব্যবস্থা করতাম।

সেবিকার কথা শুনে উম্মুল মু'মিনীন বললেন, ঘরে যে খাবার কিছু নেই তা আমার মনেই ছিল না। তখন যদি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে, তাহলে না হয় একটি দেরহাম রেখে দিতাম।

আল্লাহু আকবার। দান করার কি অনুপম নমুনা।

وَالصّٰٓئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ

রোযা পালনকারী পুরুষও রোযা পালনকারী নারী।

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ

স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারী নারী ও পুরুষ।

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ

আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও আল্লাহর যিকিরকারী নারী।

অতঃপর যারা এসব গুণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

এদের জন্য আল্লাহ তা'আলাা প্রস্তুত করে রেখেছেন, ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

মা ও বোনেরা! সূরা আহযাবের ৩৫ নং আয়াতটি পৃথিবীর সকল নারী ও পুরুষের জন্য একটি মূলনীতির মতো। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো কালে যে কোনো নারী ও পুরুষ এই দশটি গুণ অর্জন করতে পারবে, সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের অধিকারী হবে।

প্রিয় বোনেরা!

পর্দা সংক্রান্ত কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ۔

হযরত উম্মে সালমা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, মহিলাদের জন্য উত্তম মসজিদ হলো ঘরের কোণ। (তারগীব-১/১৪১)

এ হাদীসে কঠোর পর্দার কথা বলা হয়েছে, মহিলাদেরকে ঘরে বসেই নামায পড়তে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে মহিলাদের জন্য ঘর উত্তম। আবার ঘরের ভেতরের কোণকে আরও উত্তম বলা হয়েছে পর্দার জন্য।

আরেকটি হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে,

عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحَبَّ صَلَاةِ الْمَرْءِ اِلَى اللّٰهِ فِىْ اَشَدِّ مَكَانٍ فِىْ بَيْتِهَا ظُلْمَةً۔

হযরত আবুল আহওয়াজ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলাদের নামায আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিককতর পছন্দনীয়। যে মহিলা বেশি অন্ধকার কক্ষে নামায পড়েছে।

এখানে আলোকিত স্থানের তুলনায় অন্ধকার স্থানকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা অন্ধকারে পর্দার সুবিধা বেশি। অন্ধকারে সেও কাউকে দেখবে না তাকেও কেউ দেখবে না। তবে এমন অন্ধকার নয় যে একেবারে কিছুই দেখা যায় না। দেখুন! মহিলাদের পর্দার জন্য কতো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইবাদত বন্দেগীতেও পর্দা করার কথা বলা হয়েছে। যে স্থানে নামায পড়বে বা ইবাদত করবে সে স্থানটি পর্দায় ঢাকা হতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীদের বসিয়েছেন ঘরে। নারীর জন্য সবচেয়ে উত্তম ও নিরাপদ স্থান হলো নিজের ঘর। আল্লাহ তাদের পর্দার বিধান দিয়েছেন, যেন তারা ঘরের ভেতরই থাকে, যদি বাইরে যেতেই হয় তাহলে যেনো পর্দার সাথে যায়।

প্রিয় বোনেরা! মূলত আমাদের সফলতার মাপকাঠি হলো, মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি। মহিলারা নিজকে যত বেশি পর্দায় আবৃত্ত রাখবে আল্লাহ ততই তাকে পছন্দ করবেন। মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টিই তো মুসলমানের প্রথম কাজ হওয়া উচিত। আমাদের উপর তার অনুগ্রহ দয়ার শেষ নেই। আমরা তার আদেশকে অগ্রাজ্য করে কত বড় অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছি।

আজ আমাদের নারীরা ইউরোপের নারীদের অনুকরণ অনুসরণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এটা সে নারীরা কেন বুঝে না যে, পশ্চিমা নারীদের অনুসরণ অনুকরণ করে আমাদের মেয়েরা অপমান আর লাঞ্ছনার সিড়িতে পা রাখছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী সবসময়ই যৌন চাহিদার বস্তু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর এর বিপরীতে ইসলাম নারীকে দিয়েছে বিস্ময়কর মর্যাদা।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ۔

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষের। (সূরা বাকারা-২২৮)

দেখুন! আল্লাহ তা'আলাা এখানে নারীদের অধিকারকে কত সম্মান দিয়ে বলেছেন। নারীদের অধিকারের কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন। পরে বলেছেন পুরুষের অধিকারের কথা। এর পরও কি আমাদের নারীরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ মানবে না?

এরপরও কি মুসলমান নারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পথে চলবে না?

এরপরও কি মুসলমান মা বোনেরা পর্দায় আসবে না। বেপর্দা জীবন থেকে নিজেদের ফিরিয়ে আনবে না?

বিধর্মীদের অনুকরণ অনুসরণ ত্যাগ করবে না?

প্রিয় বোনেরা!

আমরা কিভাবে আমাদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। কিভাবে আমরা দূরে সরে পড়ছি আমাদের মনজিল থেকে। কিভাবে আমরা সুতা বিচ্ছিন্ন ঘুড়ির মতো মূল শিকড় ইসলাম থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ছি, সে কাহিনী অনেক দীর্ঘ। আমরা দুইশত বছর অপমানের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। সেই দুইশত বছরের বৃটিশ শাসন আমাদের শিকড়কে দুর্বল করে দিয়ে যায়। যে কাহিনী অনেক লম্বা, দুইশত বছরের ইতিহাস দুই ঘণ্টায় বলা সম্ভব নয়। শুধু বলছি, কিভাবে আমরা অপশক্তির ফাঁদে পড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ থেকে দূরে সরে পড়ছি। কিভাবে পথ হারা মুসাফিরের মতো উদভ্রান্ত হয়ে মরিচিকার পেছনে ছুটছি। আমরা এক জায়গায় সুখ রেখে সুখ খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেছি অন্য জায়গায়।

পর্দার গুরুত্ব তাঁরা বুঝেছিল

অনুগত নারী ও অনুগত পুরুষ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ

উল্লিখিত আয়াতে এ দু'টি শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণভাবে অনুগত নারী ও পুরুষ। আল্লাহ তা'আলার যে কোনো আদেশ নিষেধকে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেয়া। যে কোনো ফরমানের সামনে অকুণ্ঠচিত্তে আত্মসমর্পণ করা।

প্রিয় বোনেরা!

আজ পর্দা নিয়ে কতো রকম কথা বলা হচ্ছে, কেউ বিনাদ্বিধায় তা পালন করছে। টিটকারী হাসি মজাককে পায়ে মাড়িয়ে কতশত মা বোন পর্দা মেনে চলছেন, আল্লাহ তাঁদের জাযা খায়ের দান করুন। আমীন।

আর কত মহিলারা আছে, পর্দার কথা বললে কতো বাহানা দেখায় বলে, পর্দা মানে মনকে ঠিক রাখলেই সব ঠিক। বা মুখ ঢাকলে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আসলে হাস্যকর অযৌক্তিক এসব বাহানা করার কারণ হলো পর্দা করার ইচ্ছা নেই। যে পর্দা পালন করছে সে বাহানা না করেই পালন করছে। তারা বুঝতে পেরেছে মানার মধ্যে সফলতা। আল্লাহর আদেশ মানতে হবে সর্বাগ্রে। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এর মধ্যেই হলো সফলতা। না মানার মধ্যে বরবাদী, লাঞ্ছনা অপমান, আর পাপ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় যখন পর্দার আয়াত নাযিল হলো, তখন রাত ছিলো, ফলে কেউ জানতে পেরেছিলো, আর কেউ জানতে পারেনি। সকালে সবাই জেনেছিলো। সে কালে মহিলারাও পুরুষের সাথে একত্রে মসজিদে এসে নামায আদায় করতো। এক সাহাবিয়্যাহ (মহিলা সাহাবী) মসজিদে এসে দেখেন অন্য মহিলারা কালো বোরকা ও চাদর পড়ে শরীর ঢেকে নামায পড়ছেন। মহিলা সাহাবী তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি? অন্য মহিলারা বললো, পর্দার নির্দেশ এসে গেছে। তুমি জানো না?

মহিলা সাহাবী একথা শোনার সাথে সাথে তার সন্তানকে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। দৌড়ে যাও, ঘর থেকে আমার জন্য একটি চাদর নিয়ে এসো। এরপর সে যখন চাদর গায়ে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো তখন তার স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ করে আবার এ কি শুরু হলো?

স্ত্রী বললো, তুমিতো জান না। পর্দার বিধান এসে গেছে। এইতো মুসলমান নারী। যখনই জানতে পেরেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটা নির্দেশ এসেছে, মুহূর্তমাত্র তারা দেরি করেননি, যত দ্রুত সম্ভব সে নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে এক মুহূর্তও কাটাননি।

প্রিয় বোনেরা!

আমি আবারও বলছি, আজকাল আমাদের সমাজে এমন মানুষও আছে, তারা মস্তিষ্ক বিকৃতিতে ভুগছে কিনা জানিনা, তারা বলে পর্দা মনের বিষয়। আমি বলি, হে মনে মনে যদি পর্দা হয় তাহলে খানাপিনা ও তো মনে মনে হওয়ার কথা। সেটাও মনে মনে করে নাও। খানাপিনার জন্য এতো বিশাল খরচ করে কষ্ট করে রান্না করার কি দরকার?

যেমন কিছু ভণ্ড পীর-ফকীর আছে, তারা বলে নামায হলো দিলের বিষয়, ধ্যান হলো দিলের নামায। পাঞ্জেগানা নামায না পড়লেও চলবে। নাওযুবিল্লাহ। আল্লাহ মাফ করুন। না মানার কত বাহানা। আমরা বাহানায় যাব না। আল্লাহর নির্দেশের সাথে বাহানা করবেন না। এটা চরম বেয়াদবী। আল্লাহ পাক আমাদের সবার ঈমান আমল হেফাযত করুন। আমরা আল্লাহর আদেশ অকুণ্ঠচিত্তে পালন করব। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক যা বলেছেন সরাসরি তাঁর নির্দেশ মানতে হবে। মনে মনে পর্দা, মনে মনে নামায এসব বাহানা বাদ দিয়ে সোজাসুজি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে আত্মসমর্পণ করব। এটাই হলো মু'মিনের চরিত্র।

আল্লাহপাকের মুহব্বত

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন। (সূরা আল ইমরান-৩১)

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলাা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তোমার ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে, ইবাদত ও ইতা'আত তথা নিঃর্শতভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগী করা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। তখনই আল্লাহ তা'আলাা আমাদের ভালোবাসবেন। আমাদের গোনাহ মাফ করবেন। আমাদের প্রতি রহমত ও বরকত দান করবেন। সত্যিকারের মু'মিন ও আল্লাহ ভক্তগণ তার মালিকের (আল্লাহর) প্রতিটি আদেশ নিষেধ পালন করে। যে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসাকে সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ তা'আলার রাজি-খুশীর জন্য জানমালের কুরবানী দিতেও সে পিছপা হয় না। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলাা ভালোবাসো৷ তাদের প্রশংসা করেন। তাদের গুনাবলী বর্ণনা করেন। তাদের পুরস্কৃত করেন। গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। নেক আমল ও ইবাদতের তাওফীক দান করেন।

প্রিয় বোনেরা! আমি ইমাম গাজ্জালী (রহ.)-এর কিতাবে পড়েছি। গাজ্জালী (রহ.) লিখেছেন; আজ আমরা কি করছি? নিজেরা একটু চিন্তা করে দেখি, আমরা মাওলায়ে পাকের প্রেমে কতটুকু পাগল? মাওলা পাকের ভালোবাসা অন্তরে কতটুকু আছে, আর দুনিয়ার মুহব্বত অর্থাৎ স্বামী-সন্তানের মুহব্বত কতটুকু আছে। আজ আমাদের অন্তর তো ভরপুর হয়ে আছে দুনিয়ার মাল-সামানা আর অলংকারের মুহব্বতে। অন্তরে তো আল্লাহর জন্য একটু স্থানও ফাঁকা নেই, যা আছে তা জিহ্বার আগায়। নামকাওয়াস্তে। তাও সেটা বিপদের সময় মুখস্ত বুলির মত আওড়াতে থাকি। এখনকার মানুষ বিপদ ও মুসিবত ছাড়া আল্লাহর কথা স্মরণ করে না।

দুনিয়ার কাজ-কর্মে এতই ব্যতিব্যস্ত থাকে যে, আল্লাহকে ডাকার সময়ই পায় না। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা নেই। সব ভালোবাসা শুধু সম্পদ আর স্ত্রী সন্তানের প্রতি। এতবড় মালিক দয়ালু মেহেরবান আল্লাহকে মানুষ কিভাবে ভুলে বসেছে। অথচ আমরা বলি আমরা

আবদুল্লাহ। আল্লাহর বান্দা। কিন্তু তাঁর দাসত্ব করছি না। আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানতে কাপর্ণ্য। মুখে বলি ভালোবাসি অন্তরে নেই, এটা ভালোবাসার কি রকম নমুনা?

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) বলেছেন।

تَعْصِى الْاِلٰهَ وَاَنْتَ تَظْهَرُ حُبَّهٗ
هٰذَا لَعَمْرِىْ فِى الْقِيَاسِ بَدِيْعٌ

মুখে আল্লাহকে মুহব্বত করার দাবী করো, অথচ কাজে-কর্মে (কার্যত) নাফরমানিতে লিপ্ত রয়েছো। সুতরাং এ দাবী নিঃসন্দেহে যুক্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য।

لَوْكَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَاَطَعْتَهٗ
اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ

বস্তুতই যদি তোমার দাবী সত্য হতো, তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর অনুগত হয়ে চলতে। কেননা একথা স্বতসিদ্ধ যে সত্যিকারের প্রেমিক প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে থাকে।

মোটকথা, মুহাব্বতের চিহ্নই হচ্ছে, মাহবুবা বা প্রেমাস্পদের অনুগত হওয়া, তাঁর অনুকরন ও অনুসরণ করা এবং সব বিষয়ে তাঁর অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

হযরত আলী (রা) বলেন, জান্নাত পাওয়ার জন্য ব্যাকুল আশেকের লক্ষণ হচ্ছে; সে নেক আমল ও ইবাদতের প্রতি স্বতস্ফুর্তভাবে ধাবিত হবে। আর যে ব্যক্তির অন্তরে জাহান্নামের ভয় রয়েছে, সব সময় সে ব্যক্তি নফস ও কুপ্রবৃত্তির বিরোধীতা করবে।

অনুরূপভাবে মৃত্যুর প্রতি যে ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বাসী, সে কখনও দুনিয়ার মায়া-মুহব্বতে মত্ত হবে না।

প্রিয় বোনেরা!

আসুন! আমরা নিজের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখি, যে মহান সত্তা আমাদের অসংখ্য নেয়ামতরাজি দান করেছেন, রহমত ও বরকত দ্বারা আমাদের জীবন ভরে দিয়েছেন, সে আল্লাহর জন্য কখনও কি হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলি পরিহার করেছি? কখনও কি পানাহার ত্যাগ করেছি? আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কোনো কঠিন সাধনায় ব্রতী হয়েছি? মাওলায়ে পাকের মুহব্বতে নিজস্ব ইচ্ছা, সাধ-আহলাদ কি ত্যাগ করেছি? তাঁর নির্দেশিত কাজ কি সঠিক ও সুন্দরভাবে সমাধা করেছি?

যদি এগুলো কোনোটাই না করে থাকি, তাহলে আমাদের সবকথাই মিথ্যা। আমাদের সকল দাবী, সকল উক্তি অসার ও অর্থহীন।

নিজেকে আল্লাহর বান্দা দাবী করা অর্থহীন।

নিজেকে আশেকে রাসূল দাবী করা অর্থহীন।

নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান দাবী করা অর্থহীন।

আমাদের এ দাবী না দুনিয়াতে কোনো কাজে আসবে, না আখেরাতে কোনো উপকারে আসবে। এ দ্বারা আমরা না দুনিয়ার মাখলুকের কাছে সম্মানের পাত্র হতে পারব; না পরকালে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হব?

প্রিয় বোনেরা!

দুনিয়ার মায়া-মোহাব্বত পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে নিমগ্ন হয়ে যান। সর্বদা নিজের ভেতর ও বাহিরকে সুস্থ ও সুন্দর করার চেষ্টা চালান। কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে সামনে অগ্রসর হোন। সব কিছুই পরকালের জীবনের সাফল্যকে উদ্দেশ্য করেই করতে হবে।

আমরা কি একবার ভেবে দেখেছি? আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমরা কোন দেহটি নিয়ে যাবো, কোন মুখে কথা বলোব? মহান সেই দরবারের প্রতিটি জিজ্ঞসার সঠিক উত্তর আমাদের দিতে হবে। যার প্রস্তুতি আমাদেরকে এখন থেকেই নিতে হবে। আল্লাহ তা'আলাার ভয় থেকে এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল হওয়া যাবে না। কারণ তিনি আমাদের ভালোমন্দ সবকিছুরই খবর রাখেন।

আল্লাহ তা'আলাার প্রতিটি নির্দেশকে আন্তরিক আনুগত্য সহকারে পালন করতে হবে। নিজের জাহের বাতেন, ভেতর বাহির চিন্তা-চেতনা ধ্যান-ধারণা ও কাজ-কর্মে মোট কথা সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহর জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যেতে হবে।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

কোরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কাজের শিক্ষা দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা তওবা : ৭১)

এখানে মু'মিন ব্যক্তিদের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে, যেনো তারা সৎকাজে উপদেশ দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সৎকাজের উপদেশ প্রদান পরিহার করবে সে আয়াতে উল্লিখিত মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।

একদা হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে নেক কাজের উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, তার প্রতিদান কি? আল্লাহ তা'আলাা বলেছেন, আমি তার প্রতিটা কথার বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব দিব এবং এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমি লজ্জাবোধ করি।

হাদীসে কুদসীতে আছে– আল্লাহ তা'আলাা বলেন– হে আদম সন্তান! তুমি সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তওবা করতে বিলম্ব করে। দীর্ঘ আশা পোষণ করে, আমল বিহীন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। নেককার ভালো মানুষের মতো কথা বলে, অথচ তার আমল হয় মুনাফিকের মতো। মনের আশা পূর্ণ হলেও তুষ্ট হয় না। ধৈর্যধারণ করে না। নেক কাজে উপদেশ দেয় এবং সে নিজে নেক কাজ করে না। অসৎ কাজে প্রতিরোধ করে না এবং নিজেও অসৎ কাজ থেকে বিরত হয় না।

হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.) বলেন, একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এক জিহাদ। কিন্তু; এছাড়াও কি কোনো প্রকার জিহাদ আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই আছে, হে আবু বকর! আল্লাহর জমিনে এমনও জিহাদকারী লোক রয়েছে, যারা শহীদগণের চাইতেও উত্তম। অথচ শহীদগণের ফযীলত হচ্ছে, তাঁরা আল্লাহর কাছে জীবিত এবং জীবিকা প্রাপ্ত। তাঁরা জমিনে বিচরণ করে, তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাা ফেরেশতাগণের সামনে গৌরব করেন। তাঁদের জন্য জান্নাত সুসজ্জিত করা হয়।

হযরত আবু বকর (রাযি.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! শহীদগণের চাইতেও অধিক মর্যাদার অধিকারী মুজাহেদীন যাঁরা, তাঁরা কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, তাঁরা হচ্ছে সৎকাজের উপদেশদাতা। অসৎকাজের প্রতিরোধকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ভালোবাসা স্থাপনকারী এবং তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানে শত্রুতা পোষণকারী লোকগণ।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন, আল্লাহর কসম! আখেরাতে এমন হবে যে, বান্দা সর্বোচ্চ কোঠরীতে অবস্থান করবে এবং এই কোঠরীর নিচে আরও অনেক কোঠরী থাকবে। এগুলো শহীদগণের কোঠরীর তুলনায় অনেক উন্নত ও জাঁকজমক হবে। অধিক মূল্যবান হবে। তাদের প্রতিটি কক্ষে মহামূল্য পাথর ইয়াকুত ও জমরদ খচিত তিনশত দরজা হবে। প্রতিটি দরজায় অতি উজ্জল নূরের ব্যবস্থা থাকবে। এই বান্দা ডাগর চোখবিশিষ্ট আনতনয়না তিনলক্ষ জান্নাতী হুরকে বিবাহ করবে। এদের কারও প্রতি যখন সেই বান্দা তাকাবে, তখন হুর তরুণী বলবে, আপনি অমুক অমুক দিন সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করেছিলেন। এভাবে সে যে কোনো হুরের দিকে তাকাবে তখন তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের কথা বলে এর বিনিময়ে তাকে দেওয়া বিভিন্ন উচ্চতর মর্যাদা ও পুরস্কারের বিষয় বলতে থাকবে।

আরেক রেওয়ায়েতে আছে। আল্লাহ তা'আলাা হযরত মূসা (আ.)-কৈ জিজ্ঞেস করলেন, হে মূসা! তুমি কি আমার জন্য কোনো আমল করেছো? মূসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্য নামায পড়েছি; রোযা রেখেছি, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য সেজদা করেছি। তোমার প্রশংসা করেছি। তোমার কিতাব তেলাওয়াত করেছি, যিকির করেছি।

আল্লাহ তা'আলাা বললেন, হে মূসা! নামায তোমার জন্য দলীল স্বরূপ। রোযার বিনিময়ে তুমি জান্নাত পাবে। দান-খয়রাত তোমার জন্য ছায়ার কাজ দিবে। তাসবীহ তোমার জন্য জান্নাতে বৃক্ষ স্বরূপ হবে। আমার কিতাব তেলাওয়াতের প্রতিদানে তুমি জান্নাতে হুর ও উন্নত বালাখানা লাভ করবে। যিকির তোমার নূর হবে। এরপর আল্লাহ তা'আলাা বলবেন, শুধু আমার জন্য কি করেছো?

হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে সে আমলের কথা বলে দিন, যা আমি খালেসভাবে আপনার জন্য করব।

আল্লাহ তা'আলাা বললেন, হে মূসা! তুমি কি আমার খাতিরে কাউকে ভালোবেসেছো? অথবা আমার খাতিরে কাউকে শত্রু ভেবেছো? একথা

শোনার পর হযরত মূসা (আ.) বুঝে গেলেন যে, আল্লাহর মুহব্বতে কাউকে ভালোবাসা এবং তাঁরই খাতিরে কাউকে শত্রু ভাবাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ আমল।

কোরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে,

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔

তোমরা সৎকাজে নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আল ইমরান-১১০)

এ আয়াতে একথা সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই এ উম্মত শ্রেষ্ঠতম উম্মত হিসেবে গণ্য হয়েছে। সুতরাং এ উম্মত যদি সৎকাজের উপদেশ ও গর্হিত কাজে নিষেধ করা পরিত্যাগ করে, তাহলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিনাশ হয়ে যাবে। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদী সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ ও মঙ্গল কামনার ফলশ্রুতিতেই সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত। কারণ, তারা মানুষকে সৎকাজে উৎসাহিত করবে। মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। যাতে গোটা মানুষগোষ্ঠি শান্তিময় সুন্দর জীবন অতিবাহিত করতে পারে। সুতরাং এ উম্মতে মুহাম্মদীর দ্বারা অপরের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধিত হওয়াই কাম্য।

গীবত বা পরনিন্দা

প্রিয় বোনেরা!

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে কারীমে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গীবত ও পরনিন্দাকারীর ব্যাপারে বলেছেন যে,গীবতকারী ব্যক্তি আপন ভাইয়ের মৃতদেহের গোশত ভক্ষণকারীর মতো।

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ۔

তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা একে ঘৃণাই করবে। (সূরা হুজুরাত-১২)

হাদীসে এরশাদ হচ্ছে, اِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَاِنَّ الْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا۔

তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য।

গীবতের এরূপ জঘন্যতার কারণ হচ্ছে– মানুষ ব্যভিচার করে আল্লাহ তা'আলাার কাছে খাস দিলে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলাা তা কবুল করেন। কিন্তু গীবত হচ্ছে হক্কুল ইবাদ, বান্দার হক। বান্দা যে পর্যন্ত ক্ষমা না করবে, এ পাপ মোচন হবার নয়। গীবতকারী তার সব পুণ্য ও নেক আমলগুলো নিজে নিজে ধ্বংস করে ফেলে। আল্লাহ তা'আলাা কেয়ামতের দিন গীবতকারী ব্যক্তিকে জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করিয়ে রাখবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আগুনের তাপে তার অন্তর গীবতের কলুষ থেকে মুক্ত না হয়?

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গীবত হচ্ছে কারও অগোচরে তার সম্পর্কে এমন সব কথাবার্তা বলা, যেগুলো শুনলে সে নাখোশ হবে। এসব দোষ চর্চা সে ব্যক্তির দেহ, বংশ, কথা, কাজ-কম, ধর্ম, আচার-আচরণ, চাল-চলন। এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে করলেও তা গীবত বলে গণ্য হবে।

বর্ণিত আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে কোনো প্রয়োজনে একজন বেটে মহিলা এলো। প্রয়োজন শেষে মহিলা বিদায় নেয়ার পর হযরত আয়েশা (রাযি.) বললেন, মহিলাটি কি বেটে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! তুমি একথার দ্বারা সেই মহিলাটির গীবত করলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা অপরের গীবত করা থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করো। কারণ, গীবতের মধ্যে তিনটি মারাত্মক আপদ রয়েছে। প্রথমত, গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না। দ্বিতীয়ত, তার কোনো নেক আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তৃতীয়, তাকে অসংখ পাপের বোঝা বহন করতে হয়।

হযরত আমর ইবনে দীনার (রহ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, মদীনাবাসী এক লোকের বোন মদীনার অদূরেই বসবাস করতো। একদিন তার বোন অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোকটি বোনের সেবার জন্য প্রতিদিন সেখানে যেতো। বোনটি এক সময় অসুখে ভুগে ভুগে মারা যায়। তাকে দাফন করার পর ভাইয়ের মনে হলো ভুলবশত টাকার থলিটি বোনের কবরের ভেতর রয়ে গেছে। এরপর আবার কবর খুলে টাকার থলিটি উঠানোর সময় দেখা গেলো যে, কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

বোনের কবরের এ আযাব দেখে ভাই পেরেশান হয়ে বাড়ি এসে মাকে জিজ্ঞেস করল, তার মৃত বোন কেমন ছিলো? সে কি আমল করতো? যার কারণে কবরে তার বোনের এ আযাব হচ্ছে?

মা বললো, তোমার বোন পাড়া প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে গোপনে তাদের কথাবার্তা শুনে অন্যদের কাছে তা বলে বেড়াতো। চোগলখুরী করতো। ভাই এ কথা শুনে বুঝতে পারল, কবরে বোনের উপর এ আযাব কেন হচ্ছে।

অতএব প্রিয় বোনেরা! নারী-পুরুষ সবারই কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে গীবত ও চোগলখুরী ত্যাগ করতে হবে।

এক বুযুর্গ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো আলেম বা ইসলাম ধর্মীয়পণ্ডিত ব্যক্তির গীবত করবে, সে কেয়ামতের দিন এভাবে উত্থিত হবে যে, তার মুখমণ্ডলে লেখা থাকবে, এ ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মে'রাজের রাত্রে আমি এমন কিছু লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করেছিলাম, যারা মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করছিলো। তারা নিজেদের মুখমণ্ডল বিরাটাকার ধারালো নখের দ্বারা আচড়িয়ে ক্ষত-বিক্ষত করছিলো এবং গলিত পঁচা লাশ ভক্ষণ করছিলো। আমি জিবরাঈল (আ.) কে এদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বললেন, এরা দুনিয়াতে অন্যের গীবত করতো।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারও গীবত করেছে, কেয়ামতের দিন তার সামনে যার গীবত করা হয়েছে তার গোশত পেশ করা হবে এবং বলা হবে, এই নাও, দুনিয়াতে যারজীবিত অবস্থায় গোশত ভক্ষণ করেছিলে, এখন তার মৃত দেহের গোশত ভক্ষণ করো। এরপর তাকে পঁচা গোশত খেতে বাধ্য করা হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا۔

তোমরা কেউ কি স্বীয় মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? (সুরা-হুজরাত-১২)

কোরআনে কারীমে আল্লাহ বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

প্রত্যেক পেছনে ও সামনে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ। (সূরা হুমাযাহ-১)

অর্থাৎ এসব লোকদের শাস্তি হবে খুবই কঠিন। হুমাযাহ অর্থ কারও অনুপস্থিতিতে নিন্দাকারী। আর লুমাযাহ হলো, সামনে নিন্দাকারী। এই আয়াতটি ওলিদ বিন মুগীরা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সামনে নিন্দাবাদ করত, কটুক্তি করত। আয়াতখানা যদিও এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর উদ্দেশ্য সকলের জন্য ব্যাপক।

প্রিয় বোনেরা!

গীবত সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদেরকে বহুবার সতর্ক করে গেছেন। উম্মতের জন্য আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা কত বেশি ছিল এর কোনো উপমা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা সহ্য করতে পারেননি যে, তাঁর উম্মত কবরে-হাশরে কঠিন বিপদের মুখে পতিত হবে। তাই বার বার অসংখ্য হাদীসে উম্মতকে সতর্ক করেছন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা গীবত করো না। গীবত থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকো। পুরোপুরি তা পরিহার করো। কেননা, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য। কারণ, ব্যভিচারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু গীবতের জন্য গীবতকৃত ব্যক্তির মার্জনা ব্যতিত আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না।

অতএব গীবত করে থাকলে প্রথমে বান্দার কাছে মাফ চাওয়া উচিত। সেই সাথে আল্লাহর কাছে তওবা করা উচিত। যাতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার গোনাহও মাফ হয়ে যায়। তাহলেই পূর্ণাঙ্গ মুক্তির আশা করা যেতে পারে।

অধ্যায়-২

জান্নাতী নারী

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ يَقُوْلُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَّهٗ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ۔

হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির মতো নেয়ামত অর্জনের পর মু'মিন বান্দার জন্য নেককার স্ত্রী ছাড়া আর কোনো উত্তম বস্তু হতে পারে না। (নেককার স্ত্রীর স্বভাব হলো), স্বামী কোনো কিছু বললে স্ত্রী তা পূর্ণ করবে। স্বামী-তার দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে খুশী করে। স্বামী তাকে কোনো বিষয়ের কসম দিলে স্ত্রী তা পূর্ণ করে। স্বামী বাইরে গেলে তার মালের পূর্ণ আমানতদারী রক্ষা করে। (ইবনে মাযা-২৬৮, মেশকাত–১৩৩)

প্রিয় বোনেরা!

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) লিখেন যে, এখানে নেককার স্ত্রীর গুণের কথা বলা হয়েছে। যে স্ত্রীকে দেখলে স্বামীর মন খুশী হয়। অর্থাৎ স্ত্রীর সাজ সজ্জা, আচার ব্যবহার, কথা-বার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আমানতা দারী যদি স্বামীর মর্জি মতো হয় তাহলে এমন সংসারে তো জান্নাতী পরিবেশ বিরাজ করবেই।

স্ত্রীর উচিত স্বামীর সামনে হাসোজ্জল চেহারা নিয়ে যাওয়া, মুখ ভার করে বসে থাকা, তাকে অযথা পেরেশান করা স্ত্রীর জন্য অনুচিত। যে নারী স্বামীকে ঘরের অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে, অতি সামান্য বিষয়কে বিরাট করে তুলে ধরে, অতিরঞ্জিত মিথ্যা বানোয়াট কথা বলে। বলতে থাকে, তোমার মা এই বলেছে, তোমার বোন এই বলেছে। এ নিয়ে সংসারে অশান্তির আগুন জলে উঠে। যার দরুণ ছেলে মা ও ভাই বোনের বিরুদ্ধে চলে যায়। বেয়াদবীও করে ফেলে। এ সমস্ত নারী নিজেও জাহান্নামের পথ ধরে, সাথে স্বামীকেও নিয়ে যায়।

আজকাল আধুনিক যুগের নারীরা স্বামীর ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। স্বামীকে সম্মান করতে ভুলে গেছে। কোনো কারণে স্বামী স্ত্রীর প্রতি নাখোশ হলে স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট করা তো দূরের কথা স্বামীর সাথে কথাও বলে না। স্ত্রী খেয়ে দেয়ে আরামে শুয়ে থাকে। স্বামীর অবস্থা জানার প্রয়োজনও অনুভব করে না। আজ সংসারগুলোতে এত অশান্তি কেনো? সুখ-শান্তি বলতে নেই। রহমত বরকত আসবে কোথা থেকে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধা নেই। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা নেই। স্বামী-স্ত্রী কারও দ্বীনদারী নেই। নামায রোযার খবর নেই। পর্দা নেই। এ কারণেই সংসারগুলো আজ এরকম অশান্তির আগুনে পুড়ছে।

এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো, তাকওয়া তথা আল্লাহর নির্দেশিত পথ অবলম্বন। অর্থাৎ যাবতীয় হারাম কাজ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে হবে। নিজে বাঁচতে হবে, স্বামী সন্তানকেও বাঁচাতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যথাযথ পাবন্দি করতে হবে। অপরিচিত মাহরাম পুরুষের সাথে কথাবার্তা, দেখা সাক্ষাত করা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য পর্দা করা আবশ্যক। মনে রাখবেন, ভাগ্যবতী সে মহিলা, যে দুনিয়াতে থেকে আখেরাতের সম্বল কামাই করলো। উভয় জাহানের জন্য নিজেকে তৈরি করলো।

প্রিয় বোনেরা!

ইমাম গাজ্জালী (রহ.) লিখেন যে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাই আল্লাহভীতির প্রধান বিষয়। যাবতীয় পাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করাই হলো সাওয়াবের কাজ। আর যদি একদিকে সৎকাজ করলো, অন্যদিকে অসৎকাজও করলো, তাহলে বুঝতে হবে ইবাদতে একাগ্রতা নেই। এ ধরনের নেক কাজ কোনো কাজেই আসবে না। তাই এ বিষয়ে চিন্তা করা দরকার যে, গোনাহের বোঝা দিনে দিনে কত ভারি হচ্ছে। খবর নেয়া বড় প্রয়োজন। না হলে যে পরকালে অসহায়ত্বের আর শেষ থাকবে না।

হযরত আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে নেককার স্ত্রী দান করেছেন, তাকে যেনো অর্ধেক দ্বীনই দান করেছেন। তাই তার উচিত অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহভীতি অর্জন করা।

এ হাদীসে নেককার স্ত্রীকে দ্বীনের অর্ধেক বলা হয়েছে। কেননা স্ত্রী দ্বারা দ্বীন দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ হয়। দুনিয়ার কল্যাণ বলতে ভালোবাসা

এবং পারিবারিক জীবন অতি সুখে অতিবাহিত হয়। স্ত্রীর সেবা যত্নে স্বামীর অন্তর প্রশান্তিতে ভরে যায়। স্বামী-স্ত্রীর জীবনে ভালোবাসার ফল্গুধারা বইতে থাকে। আল্লাহর রহমত বরকত ও নুসরাতে সে সংসার পূর্ণ থাকে। সন্তান লালন-পালন এবং তাদের সভ্য মানুষ করার মতো সুযোগ হয়। আর পরকালীন কল্যাণ হলো, দ্বীনি কাজে নেককার স্ত্রী স্বামীকে সহযোগিতা করতে পারে। নামায-রোযা, ইবাদত-বন্দেগীতে মনোযোগী হওয়া যায়। কেননা নেককার স্ত্রীর কারণে অনেক বিষয়ে স্বামী আশঙ্কা মুক্ত থাকতে পারে। নেককার স্ত্রীর কারণে পাপ কর্ম ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। সন্তানরা হয় নেককার। এ নেক সন্তানরাই দুনিয়াতে সত্য পথে অবিচল থাকে। এ সন্তানরাই পরকালে পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়ার উপলক্ষ হয়। বিশেষ করে এ যুগে নেককার স্ত্রী অনেক বড় সম্পদ।

আর এর বিপরীতে যে সমস্ত নারীরা উগ্র আধুনিকতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে বেড়াচ্ছে, দ্বীন ধর্মের পরওয়া করে না। পর্দাকে তুচ্ছ করে পশ্চিমা ধাছে অর্ধ নগ্ন হয়ে চলে, সে নারীরা নিজেরা তো ধ্বংস হয়েছেই, সাথে সাথে সামাজিকতা শালীনতার বারোটা বাজাচ্ছে। এরা নিজেরা যেমন ধ্বংস হচ্ছে, তেমনি স্বামীদেরও ধ্বংস করছে। নিজের সাথে স্বামীকেও জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে।

যেমন বেপর্দা, অর্ধনগ্ন হয়ে বাজারে, মার্কেটে ঘুরে বেড়ায়। সিনেমা-থিয়েটারে যায়। পর পুরুষের সাথে উঠাবসা, হাসি-তামাশা, বেহায়াপনা করা। এমন মহিলারাই সন্তানদেরকে দ্বীন বিমুখ ও বেনামাযী বানায়। নিজের ঘরকে জাহান্নামের সাদৃশ্য করে তোলে। এরা নিজেরা তো জাহান্নামের উপযোগী হয়ই, অন্যকেও বানায়।

আদর্শ স্ত্রী

প্রিয় বোনেরা! ইমাম গাজ্জালী (রহ.) তাঁর কিতাবে লিখেছেন যে,

আদর্শ স্ত্রী তো সেই নারীই, যে বেগানা পুরুষ থেকে নিজেকে হেফাযত করে। একমাত্র স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে না। পর পুরুষের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। শরয়ী পর্দা মতো চলে। স্বামীর সেবা করে। সংসারে দ্বীনী পরিবেশ তৈরি করে। আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায় করে।

স্বামী হলো নারীর সবচেয়ে আপন, এমন আপনজন নারীর জন্য আর কেউ নেই। কোনো স্বামীই তার স্ত্রীর অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। যদি করে, তবে সে পুরুষ মানুষের কোনো পর্যায়েই পড়ে না। স্বামী-স্ত্রীকে যে উপদেশগুলো দেয়, তা স্ত্রীর প্রতি জীবনের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করেই দেয়। এ উপদেশগুলোকে শাসন মনে না করে যদি গ্রহণ করে, তাহলে কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ হবে না। সর্বাবস্থায় স্বামীর সৎ সুন্দর উপদেশগুলোকে মেনে তার অনুগত থাকুন। দেখবেন সংসার কত সুখের হয়। সংসারের সমস্ত অশান্তি দূর হয়ে শান্তির আবহ তৈরি হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি জাহান্নামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি; দেখি, সেখানের অধিকাংশ অধিবাসী নারী। সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞেস করলেন, এমন হওয়ার কারণ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা অতি মাত্রায় অভিশাপ দিয়ে থাকে এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, খাস্‌আম গোত্রের এক মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি একজন বিধবা স্ত্রী লোক, আমার বিয়ে করার ইচ্ছা আছে, আপনি বলুন, স্বামীর হক্ব কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্ব হচ্ছে, সে যখন তার স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান করবে তখন সে উটের পিঠে অবস্থান করলেও যেনো তার কাছে এসে উপস্থিত হয়।

স্বামীর আরেক হক হচ্ছে যে, তার অনুমতি ব্যতিত স্ত্রী ঘরের কোনো বস্তু কাউকে দেবে না। যদি দেয় তাহলে গোনাহ স্ত্রীর হবে, আর সাওয়াব স্বামীর হবে।

স্বামীর আরেকটি হক্ব হচ্ছে যে, তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখাবে না। যদি এরকম করে তবে এটা অযথা পানাহার থেকে বিরত থেকে কষ্ট করা হবে। কোনো সাওয়াব হবে না।

স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

মোটকথা স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক হক্ব রয়েছে এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দু'টি, প্রথম হলো, আপন সতীত্ব রক্ষা করা ও পর্দা পালন।

দ্বিতীয় হল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু স্বামীর কাছে দাবী না করা। আমাদের আদর্শ মুরব্বিগণ তো এমন ছিলেন যে, তারা যখন বাইরে যেতেন, তখন তাদের স্ত্রী-সন্তানগণ বলতো, অবৈধ উপার্জন থেকে বেঁচে থাকবেন। ক্ষুধা-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারব, কিন্তু জাহান্নামের আযাব সহ্য করতে পারব না।

দেখুন! আমাদের পূর্বসুরী শায়খ ও আকাবেরগণ তাঁদের পরিবারটিকে কেমন দ্বীনী পরিবেশে সাজিয়েছিলেন।

তাঁদের মধ্যেই এক বুযুর্গের ঘটনা। তিনি একদিন আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন, আত্মীয়-স্বজন চাচ্ছিল না যে তিনি সফরে যান। তারা বুযুর্গের স্ত্রীকে বলল, আপনি তাঁর এ সফরকে সম্মতি কেনো দিচ্ছেন? অথচ তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে আপনার খরচাদি দিয়ে যাচ্ছেনা। টাকা পয়সা ছাড়া আপনাদের চলবে কি করে?

স্ত্রী জবাব দিলেন, আমি আমার স্বামীর সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তাঁকে শুধু একজন ভোজন রসিক হিসেবেই পেয়েছি। রিযিকদাতা হিসেবে পাইনি। বরং প্রকৃত রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এ কথার উপর আমি পূর্ণাঙ্গ ঈমান রাখি। তিনি যাচ্ছেন আল্লাহর রাস্তায়, যাক, কিন্তু প্রকৃত রিযিকদাতা তো রয়েছেনই। তাহলে আমার এত চিন্তা কেনো?

দেখুন! ঈমানের কি তেজ। আসলেই তাঁরা আল্লাহকে চিনেছেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছেন। এ শিক্ষাগুলো হলো বুনিয়াদী শিক্ষা। এগুলো অর্জন করতে হয় ছোট বেলা থেকে। পারিবারিক পরিবেশ থেকে। যে বাচ্চার ঈমান শিশু বয়স থেকে পাকা পোক্ত হয়ে যায়, শয়তান তাকে কাবু করতে পারে না। ঘরই হলো সন্তানদের জন্য সবচেয়ে সুন্দর শিক্ষাগার। তাই আমাদের ঘরকে দ্বীনী পরিবেশে সাজাতে হবে। নিজেদের আচার-আচরণও সুন্নত মোতাবেক করতে হবে।

প্রিয় বোনেরা!

পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে, তাদের প্রতিটি সন্তানকে ছোট থেকে আদব শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে। উন্নত আচরণ শিক্ষা দেবে। আর কন্যা সন্তানদেরকে শিক্ষা দেবে স্বামীর সাথে ঘর সংসার করার প্রয়োজনীয় বিষয়। পারিবারিক নিয়ম কানুন। বুঝাতে হবে সুন্দর চরিত্রের মর্যাদা ও

সুফল কি? বিনয় ও নম্রতার প্রয়োজনীয়তা। হিংসা-বিদ্বেষ ও চোগলখোরীর কুফল কি?

এ ব্যাপারে এক বুযুর্গের একটি ঘটনা আমি ইমাম গাজ্জালী (রহ.)-এর কিতাবে পড়েছি। সেই বুযুর্গ তাঁর কন্যাকে যখন স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেন, তখন কন্যাকে কতগুলো মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন। বুযুর্গ বললেন, মা! এতদিন তুমি পাখির বাসার মত একটি ছোট্ট পরিসরে অবস্থান করছিলে। এখন তুমি অপরিচিত আরেকটি নতুন পরিবেশে যাচ্ছো। সেখানে তোমাকে আরও বড় পরিসরে দিন অতিবাহিত করতে হবে।

তোমাকে এমন শয্যা গ্রহণ করতে হবে, যে সম্পর্কে তোমার কোনোই ধারণা নেই। এমন সাথীকে আপন করে নিতে হবে, যার সাথে পূর্ব থেকে তোমার কোনো সম্পর্কই ছিলো না। সম্পূর্ণ নতুন। অপরিচিত। সুতরাং তুমি তার জন্য জমিন স্বরূপ হয়ে যেও, সে তোমার জন্য আসমান স্বরূপ হয়ে যাবে। তুমি তার বাঁদী হয়ে যাও, সে তোমার গোলাম হয়ে যাবে। কোনো কাজে বা কথায় খোঁচা দিওনা বা অতিরঞ্জিত কিছু করো না, যাতে সে তোমাকে দূরে সরিয়ে দেয়। যদি তুমি তাকে দূরে ঠেলে দাও, তবে সেও তোমাকে দূরে ঠেলে দেবে।

সে তোমার নিকটবর্তী হলে তুমি তার আরও নিকটবর্তী হও। সর্বদা লক্ষ রাখবে, সে যেনো তোমার কাছ থেকে ভালো শোনে, ভালো দেখে, ভালো আচরণ পায়।

কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উপদেশ দিয়েছিল, মার্জনার দৃষ্টি রাখো, তাহলে ভালোবাসা স্থায়ী হবে। আমার অসন্তোষের সময় চুপ থেকো, তাহলে কল্যাণ হবে। ঢোলের ন্যায় আমাকে আঘাত করো না, কারণ, জানা নেই হৃদয় কখন বিস্ফোরিত হয়। অধিক মাত্রায় অভিযোগ করো না, এতে ভালোবাসা হ্রাস পায়। অন্তর তোমায় অস্বীকার করতে পারে। অন্তরের উপর আমার হাত নেই। হৃদয়ে আমি যেমন ভালোবাসা আছে, তেমনি তাতে শত্রুতাও অবস্থান করে। তবে ভালোবাসা শত্রুতাকে দূর করতে সক্ষম।

আসুন নামাযী হই

মহান রাব্বুল আলামীন কোরআনে কারীমে বলেছেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

নিশ্চই মু'মিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা ফরয। (সূরা নিসা–১০৩)

হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দার উপর ফরজ করেছেন, যে ব্যক্তি সেগুলোর হক আদায় করবে এবং অবহেলা করে বরবাদ করবে না, তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি তা না করবে, তার আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে তাকে জান্নাতেও প্রবেশ করাতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে, তোমাদের কারও বাড়ির সামনে যদি একটি স্বচ্ছ নহর থাকে এবং তাতে প্রচুর পানি থাকে, সেখানে দৈনিক পাঁচবার যদি গোসল করে, তবে তার শরীরে সামান্যতম ময়লাও থাকবে? সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, না, সামান্য ময়লাও অবশিষ্ট থাকবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পাঁচ-ওয়াক্ত নামাযও ঠিক তদ্রূপ; অর্থাৎ পানির দ্বারা যেমন শরীরের ময়লা দূর হয়ে যায়, নামাযের দ্বারাও ঠিক তেমনি মানুষ গোনাহের ময়লা থেকে পবিত্র হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম কাজ কোনটি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, ঠিক সময়ে নামায পড়া।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও অজুর সাথে সঠিক সময় একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করবে, কেয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য জ্যোতি। (প্রমাণ ও মুক্তি স্বরূপ হবে)।

আর যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে না, কেয়ামতের দিন তার হাশর হবে ফেরাউন ও হামানের সাথে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায তরক করল, তার থেকে আল্লাহর রাসূলের নিরাপত্তা উঠে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পবিত্র কোরআনে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর আদম সন্তান যখন সেজদা আদায় করে, ইবলিশ শয়তান তখন অদূরে বসে কাঁদতে থাকে;

আর বলতে থাকে, হায় আফসোস! আদম সন্তানকে সেজদা করার হুকুম করা হয়েছে, আর তৎক্ষণাত তারা তা পালন করছে, আর আমাকে সেজদা করার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু আমি তা পালন করিনি। তাই পরিণামে আমার জন্য দোযখ ছাড়া আর কিছু নেই।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, সেজদার সময় বান্দা আল্লাহর নিকটতম সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়, তাই এ সময়টিতে মনভরে দোয়া করা চাই। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে,

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ اِلَّا تَرْكُ الصَّلٰوةِ

বান্দা ও কুফরীর মধ্যে যোগসেতু হলো নামায ত্যাগ করা। (অর্থাৎ নামায ত্যাগ করলে বান্দার কুফরীতে পতিত হতে বিলম্ব থাকে না) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো সে কুফরী করলো। (অর্থাৎ) ঈমানের বাঁধ খুলে যাওয়ার কারণে বা স্তম্ভ ধ্বসে যাওয়ার কারণে কুফরের অতি নিকটবর্তী হয়ে গেলো।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করছেন,

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرٍ ـ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ـ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ـ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ـ

কোন বস্তু তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখেল করল? তারা বলবে আমরা নামায পড়তাম না, আর না দরিদ্রদের খানা খাওয়াতাম, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম। (সূরা মুদ্দাসির- ৪২-৪৫)

এখানে সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ভ্রান্ত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথা-বার্তা বলতো এবং গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত থাকত। বাধা দিতো না বা সম্পর্ক ছিন্ন করত না।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ যাবতীয় আমলের মধ্যে একমাত্র নামায ব্যতীত অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরী বলে মনে করতেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, যে নামায ত্যাগ করলো, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।

ত্ববরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যার ভেতর আমানতদারী নেই, তার পূর্ণ ঈমান নেই। আর যার নামায নেই, তার দ্বীন বলতে কিছু নেই। বস্তুত দ্বীনের জন্য নামাযের গুরুত্ব এমন, যেমন শরীরের জন্য মাথার গুরুত্ব।

আরেক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে নামায ত্যাগ করলো আল্লাহ তা'আলা তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেবেন, যা দিয়ে সে প্রবেশ করবে।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো কারণ ছাড়া দুই ওয়াক্ত নামায অর্থাৎ এক ওয়াক্তকে বিলম্ব করে পরের ওয়াক্তের সাথে একত্রিত করে পড়ল, সে কবীরা গোনাহ করলো।

ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছি এবং আমি অঙ্গীকার নিয়েছি, যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের প্রতি লক্ষ রেখে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে না, তার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমার কোনো দায়িত্ব নেই।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার যে আমলের যে হিসাব নেয়া হবে তা হলো নামায। যদি তা সঠিকভাবে পাওয়া যায়, তাহলে সে সফলকাম এবং নিজ লক্ষ্যে পৌছবে। আর যদি নামাযে গলদ থাকে, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ধ্বংস হবে। যদি তার ফরযগুলোর মধ্যে কোনো কমতি থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখো আমার বান্দার আমলনামায় কিছু নফল ইবাদত আছে কিনা। এর সাহায্যে তার ফরযগুলোর কমতি পূরণ করে দাও।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হচ্ছে সঠিক সময়ে নামায আদায় করা। এরপর প্রিয় হচ্ছে পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা। এরপর প্রিয় হচ্ছে জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহকে ভয় করো এবং নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করো। রমযান মাসে রোযা রাখ। নেসাব পরিমাণ মালের যাকাত দাও। তাহলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

প্রিয় বোনেরা!

আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি যাবতীয় শর্তসহ যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পাঁচটি পুরস্কারে ভূষিত করবেন। প্রথম, রিযিকের অভাব দূর করে দেবেন ॥

দ্বিতীয়, কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

তৃতীয়, আমলনামা ডান হাতে দেবেন।

চতুর্থ, দ্রুততার সাথে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।

পঞ্চম, বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে গাফলতী ও অবহেলা করবে, আল্লাহ তা'আলাা তাকে পনেরটি শাস্তি দেবেন, এর মধ্যে পাঁচটি দুনিয়াতে তিনটি মৃত্যুর সময়, তিনটি কবরে। তিনটি হাশরের ময়দানে।

দুনিয়ার পাঁচটি শাস্তি হলো–

(১) তার সময় ও জীবিকায় বরকত থাকবে না।

(২) তার চেহারায় নেক লোকের চিহ্ন থাকবে না।

(৩) যে কোনো আমল সে করবে আল্লাহর কাছে তার কোনো সাওয়াব থাকবে না।

(৪) তার কোনো দোয়া কবুল হবে না।

(৫) নেক লোকদের কোনো দোয়াও তার পক্ষে কবুল হবে না।

মৃত্যুকালীন তিনটি শাস্তি–

(১) অপমৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা।

(২) ক্ষুধার কষ্টে মারা যাবে।

(৩) পিপাসার্ত অবস্থায় মারা যাবে, তার তখন এত বেশি পিপাসা হবে যে, কয়েক সাগর পানির পান করলেও তার পিপাসা মিটবেন না।

কবরের তিনটি শাস্তি–

(১) বে-নামাযীর কবর এতই সংকীর্ণ হবে যে, তার শরীরের দু'দিকের পাজড় একে অপরের ভেতর ঢুকে যাবে।

(২) কবরে আগুন জ্বলবে এবং দিন রাত সে তাতে জ্বলতে থাকবে।

(৩) বে-নামাযীর কবরে সুজা আকরা নামক এক ধরনের ভয়ংকর সাপ নিয়োগ করা হবে। এর চোখ দু'টি হবে আগুনের এবং তার নখগুলো হবে লোহার। প্রতিটা নখ একদিনের পথ অর্থাৎ বার ক্রোশ লম্বা হবে। সাপটি মৃত ব্যক্তির সাথে কথা বলবে, নিজেকে সুজা আকরা নামের পরিচয় দেবে। এর আওয়াজ এতই ভয়ংকর হবে যে, মনে হবে বজ্রপাত হচ্ছে। সে বলবে, তোমাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্যই আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি তোমাকে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকবো। ফযরের নামায কাযা করার জন্য ফযর থেকে যোহর পর্যন্ত। যোহরের নামায কাযা করার জন্য আসর পর্যন্ত। আসরের নামায কাজ করার জন্য মাগরিব পর্যন্ত। মাগরিবের নামায কাযা করার জন্য এশা পর্যন্ত এবং এশার নামায কাযা করার জন্য সারা রাত, অর্থাৎ ফযর পর্যন্ত। এভাবে আমি তোমাকে ছোবল মারতেই থাকব। এ বিষাক্ত সাপের আঘাত এতই মারাত্মক হবে যে, প্রতি আঘাতে বেনামাযী সত্তর গজ মাটির নিচে দেবে যাবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত বে-নামাযীর শাস্তি হতে থাকবে।

হাশরের মাঠের তিনটি শাস্তি হলো–
(১) অত্যন্ত কঠিনভাবে বে-নামাযীর হিসাব নেয়া হবে।
(২) বে-নামাযী আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হবে।
(৩) বহু অপমান অপদস্থ করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নারীর পরিচয়

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। বিষয়টি হলো, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নারী কাকে বলা হবে। কোন গুণের কারণে নারীকে শ্রেষ্ঠ বলা হবে। সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে একেকজন একেক গুণের কথা বলছেন। এভাবে আলোচনা চলতে থাকলো। হযরত আলী (রাযি.) কোনো কাজে ঘরে চলে গেলেন। ঘরে গিয়ে হযরত ফাতেমা (রাযি.)কে বললেন, আল্লাহর রাসূলের দরবারে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নারী কে, এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এ কথা শুনে হযরত ফাতেমা (রাযি.) বললেন, আমি কি বলবো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নারী কে?

হযরত আলী (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ! বলো। হযরত ফাতেমা (রাযি.) বললেন, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নারী হলো সেই, যে নারী পরপুরুষের দিকে তাকায় না এবং কোনো পুরুষকেও তার দিকে তাকাতে দেয় না। অর্থাৎ যে নারী নিজেও বেগানা পুরুষ থেকে হেফাযত থাকে এবং নিজের চোখ ও মনকে বেগানা পুরুষ থেকে হেফাযতে রাখে।

এ কথা শুনে হযরত আলী (রাযি.), রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রিয়তমা স্ত্রী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নারীর পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন, যে নারী নিজেও কোনো পর পুরুষকে দেখে না এবং কোনো পর পুরুষও তাকে দেখে না। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফাতেমা তো আমার কলিজার টুকরা। হযরত ফাতেমার একথাটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক পছন্দ হয়েছিল। তাই আনন্দিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে বলেছিলেন, সে তো আমার কলিজার টুকরা।

স্বামীর সন্তুষ্টিতে স্ত্রীর জান্নাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলাদের জন্য তার স্বামী জান্নাতের দরজা। হাদীসের রায় হলো, যে স্ত্রী স্বামীর খুশীর

উপর মারা যায় এবং সে ফরজ নামাযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে থাকে। পর্দার প্রতি যত্নশীল, তার মারা যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেবেন।

হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, স্বামীরা হলো স্ত্রীদের জন্য জান্নাতের দরজা। স্বামীদের সন্তুষ্টি মানে দরজা খুলে যাওয়া। অসন্তুষ্টি মানে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করার অনুমতি থাকলে স্ত্রীদের নির্দেশ দিতাম তারা যেন তাদের স্বামীকে সেজদা করে।

প্রিয় বোনেরা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীসে স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের আচরণের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। সুতরাং; ভালো হোক মন্দ হোক, সুশ্রী হোক, কুশ্রী হোক, খাট হোক, লম্বা হোক, স্ত্রীর উচিত স্বামীর সেবিকা হয়ে থাকা। স্বামীর সেবা করা। এই সেবার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশেষ পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। এজন্য স্বামীর সেবা করাটাকে নিজের জন্য পুরস্কার মনে করুন। এটাকে সৌভাগ্যের উপায় বলে বিবেচনা করুন। স্বামীকে খুশী রাখা স্ত্রীদের জন্য অতি সহজ বিষয়। নিষ্ঠাবান স্ত্রীর স্বামী তার প্রতি এমনিতেই সন্তুষ্ট থাকে। যে স্ত্রী স্বামীর কথা মেনে চলে। এমন নারীরা স্বামীর সোহাগীনী হয়। স্বামী তাদের বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। তাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখে।

অনেক সময় বড় বড় অপরাধও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। মনে রাখবেন, বিনয় ও নম্রতার অনেক বড় গুণ। এটি অনেক বরকতময় একটি গুণ। তাই আমাদের বিনয় ও নম্রতাকে গ্রহণ করতে হবে। অহংকার ও হিংসা পরিত্যাগ করতে হবে।

স্ত্রীর জন্য এমন কোনো কাজ করা উচিত না, যার কারণে স্বামীর নজর থেকে পড়ে যায়। অর্থাৎ স্বামীর চোখের কাটা হয়ে না উঠি। এটা সম্পদের সাথেও হতে পারে, আচারণের মাধ্যমেও হতে পারে। স্বামীর নজর থেকে পড়ে গেলে নারীর জন্য পৃথিবী হয়ে উঠে জেলখানার মতো। স্বামী যদি নিজের না হয়, নিজের ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না থাকে, তাহলে নারী জীবনের স্বার্থকতা কোথায়? নারীর জীবন তো স্বামীর সাথে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। স্বামীর স্থানটুকু আর কেউ অধিকার করতে পারে না। এ জন্য সারা দুনিয়া একদিকে আর স্বামী অন্য দিকে। এমন কোনো কাজ বা আচরণ করবে না, যার কারণে স্বামীর নজর থেকে পড়ে যান। একবার বিশ্বাস ভেঙ্গে গেলে যত কিছুই করুক পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না। তাই স্ত্রীর উচিত, স্বামীর মন মেজাজ বুঝে কাজ করা। যাতে সংসারে প্রশান্তিদায়ক পরিবেশ

বিরাজ করে। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে সত্যবাদী জীবন-যাপন করাই উত্তম। স্বামীর কাছে স্ত্রী মিথ্যা বলার অভ্যাস করে ফেললে এর প্রভাব তাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। মনে রাখবেন! কষ্ট স্বীকার করা অপদস্থ হওয়ার চেয়ে উত্তম। মানুষ দুর্বলতাগুলো ঢাকার জন্য যে প্রচেষ্টাটুকু করে, এর অর্ধেক প্রচেষ্টা যদি তা দূর করার জন্য করত, তাহলে সে জীবনে সফল হতো।

সফলতার তিনটি সবক

প্রিয় বোনেরা! মহান রাব্বুল আলামীন জন্মগতভাবেই নারীদের মাঝে সুন্দর কয়েকটি গুণ দিয়েছেন। আনুগত্য, ভালোবাসা ও মায়া মুহব্বত। নারীর মধ্যে জন্মগতভাবেই থাকে। এটা আল্লাহর দেওয়া কুদরতী গুণ। নারী জীবনে তিন ধরনের অবস্থা বিরাজ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে তিন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন পিতা, ভাই ও স্বামীর সাথে আনুগত্যের। মা-বোন এবং অন্যদের সামনে ভালোবাসার। আর সন্তানদের সাথে মমতার। যেহেতু নারীর জীবনের তিনটি দিক। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা নারীদের মধ্যে এই তিন ধরনের প্রেরণা দিয়েছেন। তারা এতই অনুগতশীল হয় যে, পিতার জীবদ্দশায় পিতার আনুগত্য করে। পিতা মারা যাওয়ার পর ভাইয়ের আনুগত্য করে। ভাই যদি বয়সে ছোটও হয় তবুও তার কথা মানে। অভিভাবক হিসেবে মানে।

আদর্শ নারীর কয়েকটি গুণ

ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে উত্তম নারীর চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে।

প্রথম গুণ– উত্তম কাজে যে নারী স্বামীকে সহযোগিতা করে। দ্বীনী কাজে স্বামীকে সহযোগিতা করে। সন্তানদের দ্বীনী পরিবেশে গড়ে তোলা এবং উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া, স্বামীর মেজাজ বুঝে তাকে ভালো পরামর্শ দেওয়া, দ্বীনী কাজে উৎসাহ দেওয়া। মনে রাখবেন! সৎ, চরিত্রবতী, উত্তম আদর্শের নারী একটি সংসারকে শান্তিময় উদ্যানে পরিণত করতে পারে।

দ্বিতীয় গুণ– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম নারীর দ্বিতীয় গুণ সম্পর্কে বলেছেন, যে স্ত্রীকে দেখলে স্বামীর অন্তর শীতল হয়ে উঠে। মনে রাখবেন! সুন্দরী স্ত্রী দেখলে চোখ প্রশান্তি বোধ করে। আর সুন্দর চরিত্রের অধিকারী স্ত্রীকে দেখলে অন্তর শীতল হয়। কত সুন্দরী নারী আছে, অতুলনীয় রূপ। কিন্তু চরিত্র ভালো নয়। আচরণ, চলা-ফেরা

দোষনীয়। স্বামীর সাথে মুহব্বত নেই। সব সময় ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। স্ত্রীর এতো রূপ, এর পরও স্বামী তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। বলুন- এ রূপ-লাবণ্য কি কাজের? এতো রূপ থাকতেও স্বামীর অন্তর শীতল করতে পারলো না, কি দাম আছে এ রূপের? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একথাটি গভীরভাবে খেয়াল করুন। তিনি বলেছেন, উত্তম স্ত্রীর গুণ হলো, তাকে দেখলে অন্তর শীতল হয়। চোখের সাথে অন্তরও প্রশান্তবোধ করবে। যে নারী বেশি বেশি স্বামীর সেবা করবে। যে নারী অধিক বিশ্বস্ত, যে কথা মান্য করে, সে সতী, খোদাভীরু, নেককার হবে এবং স্বামী তাকে দেখলেই আন্তরিকভাবে আনন্দিত হবে।

তৃতীয় গুণ–اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে নারীদের উপর কর্তা বানিয়েছেন। অর্থাৎ পুরুষ সংসারে নেতৃত্ব দেবে। সতী স্ত্রী সেই, যে নিজেকে স্বামীর বিশ্বস্ত হিসেবে গড়ে তুললো। স্বামীকে বড় মনে করে সংসার করে। অনেক স্ত্রী আছে, যারা শিক্ষা-দীক্ষায় স্বামীর চেয়ে বড়, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই স্ত্রী স্বামীকে অগ্রাধিকার দেয়, সমাজে স্বামীকে বড় করে দেখায়। এমন স্ত্রীকে আল্লাহ বড় বানিয়ে দেবেন।

চতুর্থ গুণ– সে নিজের ইজ্জত আব্রুর সংরক্ষণ করে। পুরুষেরা যেমন ময়দানে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীর পথঘাট চষে বেড়ায়, আর নারীরা নিজের ঘরে থেকে ইজ্জত আব্রু সংরক্ষণ করে। এটাও নারীদের জন্য জিহাদ। মোটকথা সতী স্ত্রী তার ভালো কাজ দ্বারা সংসারে সুখ সাচ্ছন্দ্য আনে। দ্বীনদারী আর খোদাভীরুতার দ্বারা সংসারকে জান্নাতী বাগানে পরিণত করে।

চারিত্রিক সৌন্দর্য

প্রিয় বোনেরা! আপনারা ভালো কাজের মাধ্যমে সংসারের পরিবেশ বদলে দিতে পরেন। স্বামী থেকে শুরু করে শশুর-শাশুড়ী, ভাসুরসহ পরিবারের সকলের মন জয় করতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন সততা, বিশ্বস্ততা, বিনয় ও নম্রতা। মনে রাখবেন! দুনিয়ার সমস্ত শান্তির মোকাবেলা করা সহজ, কিন্তু চরিত্রের মোকাবেলা করা কঠিন। তাই আগে চরিত্র সুন্দর করতে হবে। বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, আপনি যদি বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে কারও চেয়ে কম হন। অন্তত চারিত্রিক সৌন্দর্য্যে তার চেয়ে এগিয়ে যান। কারণ এটা মানুষের আয়ত্বাধীন। কোনো এক কবি বলেন,

বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের কোনো মূল্য নেই,
চরিত্র যদি কলুষিত হয়।
সুন্দর চরিত্রের নূর চমকাবে,
বাহ্যিকভাবে যদিও সে কালো হয়।

চোখের ঝলক কতক্ষণের, অন্তর যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে এমন রূপের কি মূল্য?

স্ত্রী যদি নিজের স্বভাব-চরিত্রের কারণে নিজের জিহ্বার তীব্রতার কারণে নিজেকে অযোগ্য করে তোলে, স্বামীর অন্তর থেকে ছিটকে পড়ে, তাহলে দোষ কার? অবশ্যই নিজের। এ জন্য উপরের রূপ সৌন্দর্যকে বাদ দিয়ে চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের দিকে নজর দিতে হবে। বাহ্যিক সৌন্দার্য্য থাকে মাত্র কয়েকদিন। আর চারিত্রিক সৌন্দার্য থাকে সারাজীবন। একটার দ্বারা চোখ জুড়ায়, আরেকটার দ্বারা জুড়ায় মন।

কানজুল উম্মাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. বলেছেন,

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمَرْءَةَ الْمُلْقَةَ الْبَزْعَةَ مَعَ زَوْجِهَا الْحِصَانُ عَنْ غَيْرِهٖ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই নারীদের ভালোবাসেন, যারা তাদের স্বামীকে ভালোবাসে। স্বামীর সাথে আনন্দ ফুর্তিতে থাকে এবং অন্যান্য পুরুষ থেকে নিজের ইজ্জত-আব্রুকে হেফাজত রাখে।

প্রিয় বোনেরা! এ হাদীসের উপর আমল করলে আপনারা আল্লাহর প্রিয় বান্দি হতে পারবেন। দুনিয়ার কারও সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক করলে কোনো ফায়দা নেই। ভালোবাসার মানুষের মৃত্যু হলে ভালোবাসা শেষ হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সাথে ভালোবাসা স্থাপন করলে তা হবে চিরস্থায়ী, যার কোনো সমাপ্তি নেই।

হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ ভালোবাসা রাখেন সেই নারীর সাথে, যে নারী স্বামীকে ভালোবাসে। যে স্বামীর সাথে আনন্দ ফুর্তিতে থাকে। আনন্দ ফুর্তি বলতে বুঝানো হয়েছে, স্বামীর সাথে হাসিখুশী থাকা। তার কথার গুরুত্ব দেওয়া। সম্মানজনক আচরণ করা। এমন যেন না হয় যে, সব সময় মুখ গোমরা করে থাকলো। স্বামীকে অবহেলা করলো। সব সময় চেহারায় রাগ ও বিরক্তির ছাপ লাগিয়ে রাখলো। স্ত্রীর কথাগুলো যদি হয় ধারালো ছুরির মতো। এমন তিক্ত কথা মুখ থেকে বের হয়, যা বিষের মতো;

তাহলে নারী হিসেবে আপনি পুরোপুরি ব্যর্থ। জগতের মুসলিম নারীরা যদি মনে মনে এই অঙ্গিকার করে নেয় যে, আজকের পর আমরা স্বামীর আনুগত্য করবো, স্বামী-স্ত্রী মিলে ভালোবাসার পথ বের করবো। সংসারটিকে করে তুলব জান্নাতী বাগান, সেখানে শুধু ভালোবাসা থাকবে। স্বামী ভালোবাসবে স্ত্রীকে, স্ত্রী ভালোবাসবে স্বামীকে। মনে রাখবেন! স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা পূর্ণ একটি সংসার জান্নাতের মতো। এতে আল্লাহর রহমত, বরকত থাকে, জীবন হয় আনন্দময়। এ আনন্দের কোনো সংজ্ঞা নেই। স্বামী যদি ভালোবাসে তাহলে তো পরম সৌভাগ্য। যদি ভালো নাও বাসে, তাহলে সেবার দ্বারা, বিশ্বস্ততার দ্বারা এবং ভালোকাজের দ্বারা স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করবে। তাতেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সেই নারীকে জান্নাতে স্থান দেবেন।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা বেশি দেখেছি। সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কেনো এমন হলো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাদের বেশির ভাগকেই তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে জাহান্নামে যেতে দেখেছি। আবার সাহাবায়ে কেরামগণ প্রশ্ন করলেন। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তারা কি আল্লাহকে অস্বীকার করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা তাদের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় এবং দয়ার কথা ভুলে যায়। এ হাদীসটি বোখারী শরীফে হযরত আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত।

প্রিয় বোনেরা! আপনারা মুহাম্মাদী উম্মতের মা। আপনারা স্বামীর অকৃতজ্ঞ কেন হবেন? আর স্বামীর অকৃতজ্ঞতার কারণে কেনো জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানাবেন?

অতএব আপনারা আজ থেকে এ ওয়াদা করুন, আমরা স্বামীর আনুগত্য করবো। এটাই আমার আধ্যাত্মিকতা। এটাই আল্লাহর প্রিয় হবার পথ। আমরা অন্তর দিয়ে স্বামীকে ভালোবাসবো। স্বামীর মন জয় করে তার সাথে আনন্দময় জীবন-যাপন করবো। নিজেকে তার সেবায় নিয়োজিত রাখবো। সে অবস্থায় মারা যাব যে, স্বামী আমার উপর সন্তুষ্ট। তাহলে জান্নাতে আমার জন্য আটটি দরজা খুলে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কবুল করুন। আমীন।

অধ্যায়-৩

মহিলা সাহাবী ও আউলিয়ায়ে কেরামগণের ঈমানদীপ্ত জীবনকথা

গামেদিয়া অঞ্চলের অশিক্ষিত এক গ্রাম্য মহিলা। একবার সে মারাত্মক এক পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ল। সে পাপ না কেউ দেখেছিলো, না কেউ শুনেছিলো। কিন্তু পাপ করার পর তার হৃদয়ে একটি অস্থিরতা, যাতনা ছিলো যা তাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে দিতো না। পানাহারে সে স্বাদ পেতো না। খাবার খেতে বসলে তার মন বলতো তুমি অপবিত্র, নাপাক। পানি পান করতে গেলে মন বলতো তুমি অপবিত্র নাপাক, তোমার কিসের পানাহার? তোমাকে প্রথমে পবিত্র হতে হবে। আর এ পাপের পবিত্রতা শাস্তি ছাড়া সম্ভব নয়। এরপর মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এসে হাজির হলো। সে আবেদন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে পবিত্র করে দিন। আমার দ্বারা যিনা হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন মহিলা গর্ভবতী হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বাচ্চার কি অপরাধ? তোমার সাথে তার কেনো প্রাণনাশ হবে? যখন বাচ্চা প্রসব হবে, তখন এসো।

লক্ষ্য করুন! নিশ্চই এ বাচ্চা প্রসব করতে তার কয়েক মাস লেগেছে। এর মধ্যে কি সে পানাহার করেনি? স্বয়ং জীবন কি তার কাছে কিছু দাবী করেনি? পানাহারের স্বাদও তার মনে বাঁচার আগ্রহ জাগ্রত করেনি? তার মন কি তাকে প্ররোচিত করেনি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করো।

কিন্তু আল্লাহর সে বান্দী দৃঢ়চিত্তে নবজাতক সন্তানকে নিয়ে রাসূলের দরবারে চলে আসে এবং আরজ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি সন্তান প্রসব থেকে অবসর হয়েছি। এখন আমার পবিত্রতায় কেনো বিলম্ব হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এখনও সময় আসেনি, এই বাচ্চাকে এখন দুধ পান করাও। যখন সে দুধ পান ছেড়ে দেবে, তখন এসো। বাচ্চাকে নিয়ে মহিলা চলে এলো।

এর মধ্যে দু'টি বছর। নিশ্চই জানেন, দুই বছর সময় লাগে বাচ্চার দুধ ছাড়াতে, এ দুই বছর সে মহিলার জন্য কত বড় পরীক্ষা ছিল। মহিলাকে পাহারা দেওয়ার জন্য না ছিল কোনো পুলিশ, না ছিল কোনো গার্ড। ছিল না জামানত বা মুচলেকা। এর মধ্যে কত জল্পনা-কল্পনা এসে

তার মনে ভীড় করেছিলো। নবজাতক শিশুর কচি মুখখানা দেখে হয়ত তার মনে বাঁচার আকাঙ্খা জেগেছিল।

কিন্তু না! মহিলার ঐকান্তিক বিশ্বাস, সুদৃঢ় অবিচল ঈমান বলতো, বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই যেতে হবে। সেখানকার শাস্তি বড়ই কঠিন।

কেটে গেল দুই বছর। শিশুটি এখন দুগ্ধ পান ছেড়ে শক্ত নরম খাবার খেতে শুরু করেছে। মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে হাজির। শিশুটির হাতে রুটির একটি টুকরা, মহিলা বলল; ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ শিশু দুগ্ধ পান ছেড়ে দিয়েছে। সে এখন রুটি খাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। এখন আমার পবিত্রতায় কেনো বিলম্ব হবে?

অবশেষে আল্লাহর এ বান্দিটির সাজা কার্যকর করা হলো। সেই সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিলেন, এ মহিলা যে তওবা করেছে, তার তওবা যদি সমগ্র মদীনাবাসীর উপর ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। (রাযী আল্লাহু আনহা)

বলুন তো। কোনো জিনিস তাকে বার বার নিজের পাপের শাস্তির জন্য তাড়িয়ে ফিরছিল? কোনো প্রকার হাতকড়া, জামানত, মুচলেকা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ছাড়া তাকে নবীজীর দরবারে তৃতীয়বার টেনে এনেছে এবং সেচ্ছায় সজ্ঞানে শাস্তি গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়েছে?

এ হলো মজবুত সুদৃঢ় ঈমানী শক্তি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এক মহিলা সাহাবীর অনুপম ভালোবাসা

এক আনসারী মহিলা সাহাবী শুনতে পান, ওহুদ যুদ্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। সাথে সাথে মহিলা পাগলের মতো হয়ে বেরিয়ে পড়ে। তখন পর্দার বিধান আসেনি, পর্দার বিধান এসেছে ৫ম হিজরীতে আর ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তৃতীয় হিজরীতে।

এ মহিলা ওহুদের রণাঙ্গনে ছুটছেন আর বলছেন, আমার প্রিয় নবীর অবস্থা কি? আমার প্রিয় নবীর অবস্থা কি?

এক ব্যক্তি বলল, তোমার স্বামী শহীদ হয়েছেন।

মহিলা বললেন, ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর রাসূলের খবর কি?

লোকটি বলল, তোমার পুত্র শহীদ হয়ে গেছে।

মহিলা বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর

রাসূলের খবর কি? লোকটি বলল, আপনার ভাইও শহীদ হয়েছেন।

মহিলা বলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর রাসূলের খবর কি?

মহিলার স্বামী-পুত্র ও ভাই শহীদ হয়ে গেছে, এখন তার কেউ নেই। কিন্তু তার হৃদয়ে নবী প্রেম এতই প্রবল যে, সেদিকে তার কোনোই ভ্রূক্ষেপ নেই।

এরপর তাকে জানানো হল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদ আছেন।

মহিলা বললেন, নিজ চোখে দেখা না পর্যন্ত আমার চোখ শীতল হবে না। বলেই মহিলা ওহুদ পানে ছুটতে আরম্ভ করেন। ময়দানে পৌঁছতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার সাক্ষাত হল। মহিলা নবীজির জামা জড়িয়ে ধরে বললেন, আপনি বেচে থেকে সমগ্র জগত শেষ হয়ে গেলেও আমার কোনো দুঃখ নেই।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য

হযরত সা'আদ (রাযি.) গায়ের রং কালো, আর্থিকভাবে অসচ্ছল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বিয়ে করবো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর ইবনে ওহাবকে গিয়ে বলো, তার মেয়ে আছে। ওমর ইবনে ওহাব ছাকাফী সুদর্শন পুরুষ, তার মেয়েও অত্যন্ত সুন্দরী। সাদ (রাযি.) নবীজির প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। ওমর ইবনে ওহাব (রাযি.) কে বললেন, আমি বিয়ে করবো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, আপনার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে। ওমর ইবনে ওহাব (রাযি.) ভাবলেন, আমার সুন্দরী মেয়েটাকে এর কাছে বিয়ে দেই কি করে। এককেতো সা'আদ কালো, কুৎসিত, এরপর গরিব। এর ঘরে আমার মেয়ে সুখী হবে না।

মেয়ের সুখ শান্তির কথা ভেবে তিনি না বলে দিলেন। এ কথা মেয়ে ঘরে বসে শুনতে পায়, তার পিতা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছেন।

মেয়েটি তার পিতাকে বললো, আব্বাজান! আপনি এ কি করেছেন? আল্লাহর রাসূল প্রস্তাব পাঠালেন আর আপনি তা নাচক করে দিলেন? যান আব্বাজান, আমাদের উপর আল্লাহর গযব আসার পূর্বেই এক্ষুণি গিয়ে হ্যাঁ বলে আসুন। হোক সে কালো, গরিব, আল্লাহর রাসূল যখন প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তাতেই আমি রাজি।

দেখুন বোনেরা! এ হল মুসলমানের নবী প্রেমের নমুনা। আল্লাহর রাসূলের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ।

আটা দিয়ে রুটি ও গোশত

হযরত হাবীব (রাযি.) তাঁর স্ত্রী আটা গুলে খামির তৈরি করলেন। যখন আগুন আনতে পাশের বাড়িতে যান। এই ফাকে এক ভিক্ষুক এসে হাঁক দেয়, আমাকে কিছু দান করুন। হাবীব (রাযি.) দেখলেন পোশাকে শীর্ণ শরীরে লাঠিতে ভর করে দাঁড়ানো অসহায় ভিক্ষুকটাকে। বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল অন্তরটা। তিনি আর দেরী করলেন না। সবগুলো আটার খামির ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। অথচ তখন তার ঘরে এই আটাগুলোই ছিল স্বামী স্ত্রীর ক্ষুধা নিবারণের শেষ সম্বল। এখন খাওয়ার মতো আর কিছুই নেই।

স্ত্রী আগুন নিয়ে ফিরে এসে দেখে আটা নেই। স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, আটা গেলো কোথায়?

হাবীব (রাযি.) বললেন, একজন ভিক্ষুক এসেছিলো, কিছু চাইলো, তাই তাকে সবটুকু আটাই দিয়ে দিলাম।

স্ত্রী ভীষণ অবাক হলো। এরপর বললো, আচ্ছা ভালো হয়েছে দিয়েছেন, সে ক্ষুধার্ত ছিল, তাই বলে সবটুকুই দিয়ে দিলেন? এক রুটি পরিমাণ আটা রেখে দিতেন, দুজনে ভাগ করে খেতাম। হাবীব (রাযি.) বললেন, যাকে দিয়েছি তিনি অনেক বড় লোক, বিপুল সম্পদের মালিক, তিনি যখন ফেরত দেবেন, তখন অনেক দেবেন। হাবীব (রাযি.)-এর বুদ্ধিমান স্ত্রী খুশী মনে তা মেনে নেয়।

কিছুক্ষণ পর দরজায় করাঘাত পড়ে। এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলেন হাবীব (রাযি.)। দেখেন এক আগন্তুক গোশতের পেয়ালা আর রুটির টুকরি নিয়ে দাড়িয়ে আছেন। হাবীব (রাযি.) গোশতের পেয়ালা আর রুটির টুকরীটা হাসি মুখে গ্রহণ করলেন। স্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। স্ত্রী তো অবাক! তার স্বামীর হাতে গোশতের পেয়ালা মাথায় রুটির টুকরী। হাবীব (রাযি.) বললেন, দেখলে আমি বলেছিলাম না যাকে দিয়েছি তিনি অনেক বড়লোক, বিপুল সম্পদের মালিক। দেখলে! তিনি কত উদার ও দানশীল। আমরা দিয়েছি শুধু আটা; আর বিনিময়ে পেলাম রুটি আর গোশত।

ফেরাউনের দাসী

ফেরাউনের এক দাসী ছিলো। সে কালেমা পড়ে গোপনে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু তা বেশি দিন গোপন থাকেনি। খবর ফেরাউনের কাছে পৌঁছল। ফেরাউন তাকে দরবারে তলব করলো। দাসীর দু'টি কন্যা সন্তান ছিলো। একটি দুগ্ধ পোষ্য, অপরটি তার চেয়ে বড়।

ফেরাউন রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললো, এতবড় দুঃসাহস? আমার দাসী, আমার খেয়ে পড়ে মূসার রবকে প্রভূরূপে গ্রহণ করলি?

ফেরাউন দাসীর জন্য নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা করলো। বড় একটি কড়াই আনা হলো, তাতে তেল ডেলে আগুনে গরম করা হলো। প্রচণ্ড তাপে কড়াই ভর্তি তেল টগবগ করতে থাকে। ফেরাউন দরবার বসিয়ে সভাসদদের সামনে দাসীকে বলল, তোর জন্য পথ দু'টি। মূসার খোদাকে অস্বীকার করবি, নয়তো এই ফুটন্ত তেলে জ্বলে যাবি। আগে তোর সন্তান দু'টিকে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করব, এর পর তোকেও। মূসার খোদাকে বাদ দিয়ে আমাকে মেনে নে। আমি তোর জীবনটাকে জান্নাতে পরিণত করে দেবো। বল, তোর সিদ্ধান্ত কি?

মহিলা বলল, আমার মাত্র দু'টি সন্তান, যদি আরও সন্তান থাকতো, আর তুমি যদি তাদের সব কটাকে এই ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করতে এরপরও আমি আমার ঈমান থেকে এক চুল পরিমাণও নড়তাম না।

তোমার যা করার করতে পারো, আমি যা করেছি বুঝে শুনেই করেছি। মূসা (আ.) আমার নবী, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের রব। তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি তোমাকে খোদা মানতে প্রস্তুত নই।

এরপর ফেরাউন ক্ষোভে ফেটে পড়লো। মহিলার বড় সন্তানটিকে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করলো। মুহূর্তের মধ্যে ছেলেটি মাছের ন্যায় ভাজা হয়ে গেলো। এরপর দুধের শিশুটিকেও ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করে সেও মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধ হয়ে যায়। তবুও মহিলা একটু আহ্ ওহ্ও করে নাই। দু'টি সন্তান হারানোর বেদনা তাকে একটুও বিচলিত করে নাই। ঈমান থেকে একচুল পরিমাণও বিচ্যুত হয় নাই।

এরপর ফেরাউন মহিলাকে ধরে সেই ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করে। মহিলা অটুট ঈমান নিয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে পৌঁছে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে বাইতুল মোকাদ্দাসে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে যখন উর্ধাকাশের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন নিচ থেকে তিনি জান্নাতী সুঘ্রাণ পাচ্ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইল (আ.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে জিব্রাইল! আমি নাকে জান্নাতের সুঘ্রাণ অনুভব করছি।

জিব্রাইল (আ.) উত্তরে বললেন, এই সুঘ্রাণ ফেরাউনের দাসীর কবর থেকে আসছে।

এক বাঁদী ও মালেক বিন দীনার (রহ.)

একদিন মালেক বিন দীনার (রহ.) বাজারে গেলেন। অতিশয় রূপসী এক দাসী তার নজরে পড়ে। সাথে এক খাদেম।

মালেক বিন দিনার তার কাছে এগিয়ে গেলেন। ভালো করে দেখলেন রূপসী মহিলাকে। পছন্দ হয়ে গেলো।

দাসীকে বললেন, তোমাকে ক্রয় করতে চাই।

ময়লা জরাজীর্ণ কাপড় চোপড় দেখে দাসী অবজ্ঞার হাসি হেসে বললো, তোমার মতো ফকির ক্রয় করবে আমাকে!

মালেক বিন দিনার বললেন, হ্যাঁ আমি তোমাকে ক্রয় করতে চাই। দাসী হেসে তার খাদেমকে বললো, লোকটিকে ধরে মনিবের কাছে নিয়ে চলো, আমার সাথে তামাশার মজাটা বুঝাব আর দরবারে নিয়ে উপযুক্ত জবাব দেবো।

দাসী মালেক বিন দীনারকে দরবারে নিয়ে যায়, রাজকীয় দরবার, দাসীর মনিব সিংহাসনে উপবিষ্ট, দাসী বলল, জাহাপনা! আজ মজার এক ঘটনা ঘটেছে।

কি ঘটনা? মনিব জানতে চাইল।

দাসী বলল, এই ফকির বেশী লোকটা আমাকে ক্রয় করতে চায়। এ কথা শুনে সমস্ত দরবার হেসে উঠে।

এবার মনিব হেসে বলেন, আচ্ছা বলোতো ঘটনা কি, আসলেই কি তুমি আমার এ দাসীকে ক্রয় করতে চাও?

মালেক বিন দীনার বললেন, হ্যাঁ, আমি এই দাসীকে ক্রয় করতে চাই।

মনিব বললেন, তা দাম কত দেবে?

মালেক বিন দীনার বললেন, এতো অনেক সস্তার মাল, বড় জোর দু'টি খেজুরের বীচি দিতে পারি।

মূল্যের পরিমাণ শুনে গোটা দরবারে হাসির রোল উঠল। মনিবও হেসে উঠে বললেন মিয়া সাব! আপনি এসব কি বলছেন?

মালেক বিন দীনার বললেন, দেখুন! এর অনেক ক্রটি আছে, সে কারণে দু'টি খেজুরের বীচির তুলনায় দাম ঠিকই আছে।

মনিব বললেন, তা মিয়া সাহেব বলবেন, কি সেই ক্রটিগুলো?

মালেক বিন দীনার বললেন, এ মহিলা যতই রূপসী হোক, সুগন্ধি ব্যবহার না করলে এর ঘামে ভেজা শরীর দুর্গন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিদিন দাত পরিস্কার না করলে মুখের দুর্গন্ধে কাছে ঘেষা যায় না।

মাথা না আচঁড়ালে মাথায় উকুন হয়ে যায়, আর সে উকুন তার মাথা থেকে আপনার মাথায় এসে পড়ে।

আর চারটি বছর অতিক্রান্ত হলে মহিলা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। প্রস্রাব পায়খানা করে, চিন্তিত হয়, দুঃখ বেদনায় জর্জরিত হয়।

রাগ ও ক্ষোভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়।

নিজের কামনা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে আপনাকে ভালোবাসে। এ ভালোবাসা হল স্বার্থের ভালোবাসা।

এরপর মালেক বিন দীনার (রহ.) বললেন, আমার কাছেও একটি দাসী আছে, ক্রয় করবেন?

মনিব জিজ্ঞেস করেন, সে কেমন?

মালেক বিন দীনার বললেন, সে মাটির নয়, মেশক আম্বর ও কর্পুরের তৈরি।

তার চেহারায় নূরের দ্যুতি চমকায়। তার আঙ্গুলের একটি অংশ যদি সাত তবক জমিনের ঘোর অন্ধকারে ঢু' মারে, তাহলে এই অন্ধকার আলোতে পরিণত হবে।

যদি তার একখানা হাত সূর্যকে দেখানো যায়, তাহলে তার সামনে সূর্য অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে।

সে যদি পৃথিবীতে থুথু ফেলে, তাহলে সব সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যাবে।

যদি সে মৃত মানুষের সাথে কথা বলে, তাহলে মৃত মানুষ জীবিত হয়ে যাবে।

যদি জীবিত মানুষ তাকে এক নজর দেখে, তাহলে তার কলিজা ফেটে যাবে।

যদি সে তার উড়নাটা মুহূর্তের জন্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়, তাহলে সমগ্র জগত সুঘ্রাণে মৌ মৌ করবে।

সে জাফরান ও মেশকের বাগানে বিচরণ করে এবং জান্নাতের একটি ফোয়ারা তাসনীমের পানি পান করে।

তার ভালোবাসা নিঃস্বার্থ ও বাস্তব।

কখনও কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

তার হায়েজ হয় না, নেফাস হয় না– প্রস্রাব-পায়খানা করে না। বার্ধক্য তাকে স্পর্শ করে না।

ঝগড়া করে না।

সদা সন্তুষ্ট।

চির যুবতী।

তার মৃত্যু নেই।

এবার বলুন! আপনার দাসী দামী, নাকি আমার দাসী?

মনিব বললেন, আপনি যার কথা বলছেন, সেইতো দামী।

মালেক বিন দীনার (রহ.) বললেন, বলবো তার দাম কতো?

মনিব বললেন, বলুন।

মালেক বিন দীনার বললেন, তার দাম দু'টি খেজুর বিচির চেয়েও সস্তা। মনিব বললেন, তাকে পেতে হলে কি করতে হবে?

মালেক বিন দীনার বললেন, তার মূল্য হলো আপনি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

সৃষ্টির ভাবনা ভুলে যান, স্রষ্টার সন্তুষ্টিকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিন।

গভীর রজনীতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, তখন আপনি উঠে দু রাকাত নফল নামাজ পড়ুন।

এবং নিজে যখন আহার করবেন, তখন গরিবদের কথা স্মরণ করুন। এ কয়টি কাজ করলে আমার দাসী আপনার হয়ে যাবে।

দাসীর মুনিব তাকে বললেন, দাসী তুমি কি শুনেছ তিনি কি বলেছেন?

দাসী বলল, হ্যাঁ শুনেছি।

মনিব বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর নামে আযাদ করে দিলাম। আর আমার সমুদয় ধন-দৌলত সদকা করে দিলাম।

এরপর মনিব তার মহলের দরজার পর্দা কেটে তা দ্বারা পোষাক তৈরি করে তা পরিধান করলেন, গায়ে থাকা মূল্যবান পোশাকটিও দান করে দিলেন। দাসী বলল, আপনি যখন সবকিছু সদকা করে দিয়ে দরিদ্রতা অবলম্বন করলেন, আমিও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনার সঙ্গী হলাম।

মালেক বিন দীনার (রহ.) তাদের দুজনের বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। এরপর তারা দু'জন সময়কার শ্রেষ্ঠ আবেদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

অশ্রুঝরা কাহিনী

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)। তিন মহাদেশের বাদশা ছিলেন। এরপরও তিনি নিজে গ্রহণ করেছিলেন দরিদ্রতাকে। তিনি খলীফা থাকা অবস্থায়ও তার ঘরে ঠিকমত চুলা জ্বলতনা। আর তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রহ.) ছিলেন আরেক খলীফার কন্যা।

একদিন খলিফার ঘরে মোটা আটার রুটি তৈরি হলো, তাঁর স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খেতে বসেছেন, ঘরে রুটি দিয়ে খাওয়ার মত তরকারী ছিলো না। তখন তারা কাঁচা পেয়াজ দ্বারা রুটি খেলেন।

দাফতরিক কাজ শেষে ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) ঘরে এলেন। দেখতে পান তার মেয়েরা মুখে কাপড় চেপে কথা বলছে।

ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে তোমাদের? মুখে কাপড় চেপে কথা বলছো কেন?

খাদেমা কাঁদতে শুরু করে বলল, আজ আপনার মেয়েরা কাঁচা পেয়াজ দ্বারা রুটি খেয়েছে। এ ছাড়া ঘরে আর কিছুই ছিলো না।

আহ! ভাবতে পারেন কি? তিন মহাদেশের বাদশার মেয়েরা, তাঁর স্ত্রী কত নির্মোহ জীবন কাটিয়েছেন?

এ যুগে আমাদের দেশে দিনমজুরের মেয়েরাও এখাদ্য খেতে রাজী হবে না। অথচ ইতিহাস বলছে, মহা প্রতাপশালী খলীফা হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.)-এর স্ত্রী-কন্যারা রুটি খেলেন কাঁচা পেয়াজ দ্বারা।

একথা শুনে ওমর বিন আব্দুল আজিজ কাঁদতে শুরু করেন, কোনো বাবা মা চান না তাদের সন্তানেরা কষ্ট পাক।

ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) অশ্রুভেজা কণ্ঠে কন্যাদের বললেন, আমার কন্যাগণ! আমি তোমাদেরকে অনেক সুস্বাদু খাবার খাওয়াতে পারতাম। সেজন্য আমাকে হারাম পথে উপার্জন করতে হতো।

আর তার ফলে আমাকে জাহান্নামে যেতে হতো। কিন্তু জাহান্নামের আযাব সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। তোমরা ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ধৈর্যের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করবেন।

যারা হারাম বর্জন করে অভাব অনটনের জীবন বরণ করে নেয়, তাদের জন্য আল্লাহর পাকের ওয়াদা আছে। আল্লাহ তাদের প্রতিপালন করেন।

কিন্তু হারাম সম্পদে এই ওয়াদা নেই, বরং হারামের জন্য ঘোষণা আছে, যারা হারাম সম্পদ ভোগ করে, হারাম উপার্জন করে, আল্লাহ তাদেরকে অপদস্ত করেন এবং যারা সন্তানদের জন্য হারাম সম্পদ রেখে কবরে যায়, তাদের বংশধররা আজীবন কাঁদে। সে মৃতব্যক্তি কবরে কাঁদে, আর তাদের বংশধররা দুনিয়াতে কাঁদে।

আদর্শ একটি বিয়ে

প্রিয় মা বোনদের বলছি! হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর উত্তরসূরী হয়ে যান। যার বিয়ে হয়েছিল মসজিদে নববীতে। কেমন ছিল সে বিয়ের অনুষ্ঠান? হযরত আলী (রাযি.) এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ফাতেমাকে কবে উঠিয়ে দেবেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ব্যবস্থা হচ্ছে, (বিয়ে দুমাস পূর্বে হয়ে গিয়েছিল)। দেখুন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু বলেননি, তোমরা বিয়ের ব্যবস্থা করো জাকজমকের সাথে। ঢাক-ঢোল, শানাই-ফানাই নিয়ে এসো। দুজাহানের বাদশার কন্যা। আবার ফাতেমা (রাযি.) জান্নাতে নারীকুলের সর্দার। তাকে স্বামীর ঘরে পাঠানোর জন্য তো বিশাল শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করার কথা ছিলো।

কিন্তু না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছুই বলেননি। মাগরিবের নামাজের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাশরীফ নিয়ে এলেন। হযরত ফাতেমা (রাযি.) বলেন, আমি ঘরের

কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ঘরের মেয়েরা যেমন নানা কাজে ব্যস্ত থাকে, আমিও তাই করছিলাম।

এমন সময় আমার কানে পিতাজী হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোবারক আওয়াজ ভেসে এলো। তিনি কাউকে বলছেন, উম্মে আয়মানকে ডেকে আনো।

উম্মে আয়মানের মা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মা হযরত আমেনা (রাযি.)-এর দাসী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে আয়মানকে বড় ভালোবাসতেন। তাঁর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, কেউ কোনো জান্নাতী নারীকে বিয়ে করতে চাইলে উম্মে আয়মানকে বিয়ে করো।

উম্মে আয়মন এসে হাজির হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উম্মে আয়মান, যাও ফাতেমাকে আলী (রাযি.)-এর ঘরে রেখে আসে। আমি এশার নামাজ পড়ে আসছি। আলীকে বলবে, আমার জন্য অপেক্ষা করতে।

এই নবী নন্দিনী বেহেস্তের নারী কুলের সর্দার হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর বরাত শোভাযাত্রা যাচ্ছে;

পায়ে হেঁটে,

না সাথে বাপ গেলেন, না অন্য কেউ।

উম্মাহাতুল মু'মিনীন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র মা। যাঁদের সমতুল্য কোনো নারী এ ধরাপৃষ্ঠে আগমন করবে না।

হযরত উম্মে সালমা (রাযি.) হযরত জুয়াইরিয়া (রাযি.) হযরত আয়েশা (রাযি.) সবাইতো আছেন। কিন্তু স্বামীর ঘরে রেখে আসতে যাচ্ছেন কেবল উম্মে আয়মান। তাও পায়ে হেঁটে। গাড়ি ঘোড়া কোনো কিছুতেই না চড়ে।

না কাপড় পাল্টেছেন, না হাতে মেহদী লাগিয়েছেন। না গায়ে হলুদ, না অলংকার পরেছেন, না কোনো হৈ হুল্লোড়?

উম্মে আয়মান হযরত আলী (রাযি.)-এর ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। আলী (রাযি.) দরজা খুলে হয়রান হয়ে গেলেন। অভিভূত হয়ে গেলেন। কি বলবেন, ভাষা খুজে পাচ্ছেন না, তবুও বললেন, একি?

উম্মে আয়মান বললেন, ভাই তোমার আমানত বুঝে নাও। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এশার নামাজের পর তিনি তাশরীফ আনবেন।

দেখুন মা বোনেরা! দো জাহানের সরদারের চার কন্যার সব চাইতে প্রিয় কন্যার বিয়ের চিত্র। এমন শ্রেষ্ঠ কন্যা কি পৃথিবীর কেউ দেখাতে পারবে?

যখন প্রিয় রাসূলের এই প্রিয় কন্যা পুলসিরাত অতিক্রম করবেন; হাশরের ময়দানে তখন এলান হবে, সবার দৃষ্টি অবনত করো। হযরত ফাতেমা (রাযি.) পুলসিরাত পার হবেন।

বিয়ে-শাদীর ব্যাপারটা কত সহজ সরল ছিলো, অথচ দেখুন! আজকের আমাদের সামাজিকতা। নাচ গান আর নানা কুসংস্কারের বেড়াজালে তা আজ কত কঠিন করে ফেলেছি আমরা।

অথচ আমাদের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হওয়া দরকার ছিল, হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর এ মোবারক বিয়ে। আমাদের পুরুষদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারতো হযরত আলী (রাযি.)-এর এ বিয়ে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের সময় হযরত ফাতেমা (রাযি.) কাঁদছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে আদরের কন্যাকে কাছে ডেকে বললেন, মা কেঁদোনা, আমার সাথে তোমারই সর্ব প্রথম সাক্ষাত হবে।

এর কয়েক মাস পর হযরত ফাতেমা (রাযি.) গুরুতর অসুস্থ। শেষ বিদায়ের সময়। হযরত আলী (রাযি.) জরুরী কাজে বাইরে গেছেন। হযরত ফাতেমা (রাযি.) খাদেমাকে ডেকে বললেন, পানির ব্যবস্থা করো। পানির ব্যবস্থা করা হলো ।

হযরত ফাতেমা (রাযি.) গোসল করলেন। এরপর বললেন, আমার চারপায়া খাটিয়া ঘরের মাঝখানে নিয়ে রাখো। চারপায়া ঘরের মাঝখানে রাখা হলো। তিনি গিয়ে সেখানে শুয়ে পড়লেন। এরপর শায়িত অবস্থায় কেবলামুখি হলেন। শোয়া অবস্থায় খাদেমাকে বললেন, এখন আমি বিদায় নিচ্ছি দুনিয়া থেকে। হযরত আলী (রাযি.) এলে বলবে, আমার গোসল হয়ে গেছে। এরপর আমাকে আর গোসল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এভাবেই আমাকে যেনো দাফন করে দেওয়া হয়।

এতটুকু বলার পর তিনি নীরব হয়ে গেলেন। চলে গেলেন মাওলায়ে আযীমের কাছে।

এর একদিন আগের ঘটনা। ফাতেমা (রাযি.) সায়্যিদা আসমা বিনতে উমায়েস (রাযি.) কে বলেছিলেন, আমার জানাযার এমন ব্যবস্থা

করবে, যাতে লোকজন আমার লাশের ব্যাপারে কোনো ধরনের ধারণা না করতে পারে।[১]

কারণ, লোকজন আমার লাশ দেখলে একেকজন একেক রকমভাবে আমার বর্ণনা দেবে।

যেমন,

কেউ বলবে, নবী নন্দিনী দেখতে লম্বা ছিলেন।

কেউ বলবে, নবী নন্দিনী দেখতে বেটে ছিলেন।

কেউ বলবে, নবী নন্দিনী মোটা ছিলেন।

কেউ বলবে, নবী নন্দিনী হালকা পাতলা ছিলেন।

এসব যেন কেউ বলতে না পারে, সে জন্য কঠোর পর্দার ব্যবস্থা করবে। হযরত আসমা (রাযি.) বললেন, আমরা যখন হাবশায় হিজরত করি, তখন সেখানে দেখেছিলাম, যখন কোনো মহিলা মারা যেতো, তার খাটিয়ার চার কোণে চারটি খুটি স্থাপন করত। এরপর সেগুলোতে কাপড় বাধা হতো। এতে তার জানাযার সময় কেউ তার লাশ দেখতে পেতো না।[২]

একথা শুনে ফাতেমা (রাযি.) বললেন, সেভাবেই আমার লাশের ব্যবস্থা করবে।

প্রিয় মা বোনেরা! এজন্যই আহ্বান করছি, হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করুন। যিনি মৃতুর পরও নিজের জন্য লজ্জা বিনম্রতার চাঁদরের ব্যবস্থা করে গেছেন।

বুকের রক্তে পায়ে মেহদী লাগাই

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাযি.)। উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত হোসাইন (রাযি.)-এর শাহাদাতের পর সত্য ন্যায়ের পক্ষে ইবনে জোবায়ের (রাযি.) ই ছিলেন উমাইয়াদের জন্য সর্বশেষ বাধা। তাই উমাইয়ারা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকফীকে পাঠাল ইবনে জোবায়েরকে নির্মূল করতে।

---

১. হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাযি.)-এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল হযরত জাফর তাইয়্যার (রাযি.)-এর সাথে। (হযরত জাফর হযরত আলী (রাযি.)-এর ভাই) মূতার যুদ্ধে তিনি শহীদ হওয়ার পর হযরত আসমার বিয়ে হয় হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে। হযরত আবু বকর (রাযি.) এর ইন্তেকালের পর বিয়ে হয় হযরত আলী (রাযি.)-এর সাথে। হযরত ফাতেমা (রাযি.) এর শেষ দিনগুলো অতিবাহিত হয় আবু বকর (রাযি.)-এর খেলাফতকালে। আসমা (রাযি.) সেই সময় হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর সেবা শুশ্রুষা করতেন।

২. হযরত আসমা (রাযি.) হযরত জাফর (রাযি.)-এর সাথে হাবশায় হিজরত করেছিলেন।

আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের (রাযি.) কে মক্কায় অররোধ করল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের সাথে মাত্র আঠারো জন সৈন্য। আর বিপক্ষে তিন হাজার। এরপরও হাজ্জাজ আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরকে সন্ধির প্রস্তাব দেয়।

আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের মায়ের কাছে এলেন। বললেন, মা সন্ধির প্রস্তাব দিচ্ছে শত্রুপক্ষ। যদি সন্ধি করি, তাহলে প্রাণে বেঁচে যাবো।

হযরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের মা হযরত আসমা (রাযি.) হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর বড় মেয়ে। হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর বড় বোন।

হযরত আসমা (রাযি.) ছেলে আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের (রাযি.)-কে বললেন, বেটা তুমি সত্য বা ন্যায়ের পক্ষে ছিলে বলে যদি বিশ্বাস করো এবং সত্যের দাওয়াতই যদি দিয়ে থাকো, তাহলে তুমিও আপন শহীদ সাথীদের মতো ন্যায়ের পথে নিজের জান উৎসর্গ করে দাও। নিজের লাগাম বনু উমাইয়াদের হাতে তুলে দিও না।

আর দুনিয়া কামাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমার প্রতি রয়েছে আফসোস যে, তুমি নিজের জানকেও ধ্বংস করেছো সাথে নিজের সাথীদেরকেও হত্যা করিয়েছো।

তুমি যদি বলো, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু সাথীদের দুর্বলতার দরুন এ মুহূর্তে মোকাবেলা করব সে শক্তি আমার নেই। তাহলে শোনো, সাহস হারানো অভিজাত ও ধার্মিকদের আদর্শ নয়। আর দুনিয়া সর্বদা থাকার স্থান নয়। সত্যের পথে আত্ম উৎসর্গ করাই শ্রেয়।

আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাযি.) বললেন, মা জননী, আমার মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। তবে ভয় হলো, আমার মৃত্যুর পর শত্রুপক্ষ আমার নাক কান কেটে বিকৃত করে দেবে এবং আমার মৃতদেহ ফাসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

একথা শুনে হযরত আসমা (রাযি.) বললেন,

বেটা! বকরী জবাই করার পর তার চামড়া উঠিয়ে নিলে বকরীর কি কোনো কষ্ট হয়?

এরপর মা আসমা (রাযি.) ছেলেকে বুকে টেনে নিলেন। আলিঙ্গন করলেন, সর্বশেষ আলিঙ্গন। সর্বশেষ সাক্ষাত। এক মা তার প্রিয় সন্তানকে পাঠাচ্ছেন তরবারীর নিচে। শাহাদাতের সবক দিয়ে। কিন্তু আলিঙ্গন যখন শেষ হলো, হযরত আসমা (রাযি.)-এর ভ্রু কুচকে গেলো। জিজ্ঞেস করলেন, বেটা গায়ে তুমি এটা কি পড়েছো?

মা এটা বর্ম। যুদ্ধে সব সৈনিকরাই এটা পরে।

আসমা (রাযি.) বললেন, বেটা! আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীরা এ পোশাক পরিধান করে না, যাও এ পোশাক খুলে ফেলো।

আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাযি.) বর্ম খুলে ফেললেন। একটি সাধারণ পোশাক পরে, সাথীদের নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে গেলেন।

এরপর মাত্র আঠার জন সঙ্গী নিয়ে তিন হাজার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যেতে লাগলেন। তার ঈমানদ্বীপ্ত জযবার সামনে শত শত শত্রু বিনাশ হতে লাগলো।

অবশেষে শত্রু দল ভিন্ন পথ অবলম্বন করলো। আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাযি.) ছিলেন পাহাড়ের নিচে। শত্রুদল আবু কুরাইস পাহাড় থেকে নিচে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো। একটি পাথর আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাযি.)-এর মাথায় আঘাত হানে। রক্তের ফোয়ারা ছুটল।

মুজাহিদের ঈমান দ্বীপ্ত খুন মাথা থেকে বুকে, এরপর গড়িয়ে রক্তধারা পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিলো। তিনি নিজের অজান্তেই বলে উঠলেন, আমরা কোমরের সামান্য যখমে কাপড় রক্তরাঙ্গা করিনা বরং আমরা বুকের রক্তে পদতল রাঙ্গাই। বুকের রক্তে পায়ে মেহদী লাগাই।

এরপর তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে মাওলার দরবারে চলে যান।

শাহাদাতের সময় তাঁর শেষ কথা ছিল

আমার প্রিয় মা! এখন আমার মৃত্যুর পয়গাম আসবে। কেঁদো না। তুমিইতো আমাকে পাঠিয়েছিলে।

তাঁর শাহাদাতে উমাইয়া সেনারা উচ্চস্বরে নারায়ে তাকবীর দিয়েছিলো। তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) বলেছিলেন, এদের প্রতি লক্ষ্য করো, যার জন্মের আনন্দে সাহাবায়ে কেরামগণ উচ্চস্বরে নারায়ে তাকবীর দিয়েছিলেন, আর আজ তাঁর শাহাদাতের আনন্দে এরা তাকবীর উচ্চারণ করছে।[৩]

৩। আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের এর শাহাদাতের পর হাজ্জাজ তাঁর মাথা কেটে খলীফা আবদুল মালিকের কাছে প্রেরণ করে। মৃতদেহ জাহুন নামক স্থানে ঝুলিয়ে রাখে। হযরত আসমা (রাযি.) সেই স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় ছেলের লাশ এ অবস্থায় দেখে বললেন, এ নিপুণ অশ্বারোহীর এখনও সাওয়ারী থেকে নামার সময় হয়নি? খলীফা আবদুল মালেক তা জানতে পেরে এ আচরণের জন্য হাজ্জাজকে তিরস্কার করলেন এবং লাশ মায়ের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দেন।

অটুট ঈমান

মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে আমারা (রাযি.)-এর ছেলে হাবীব (রাযি.)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পাঠালেন মিথ্যা নবীর দাবীদার মোসাইলামায়ে কাযযাবের কাছে দূত হিসেবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবীব (রাযি.) কে বলে দিলেন, যাও! মুসায়লামাকে গিয়ে বলবে, সে যদি তওবা করে তাহলে তাকে কিছু বলা হবে না।

হাবীব (রাযি.) মুসায়লামার কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা: এর পয়গাম দিলেন। কিন্তু মুসায়লামা হাবীব (রাযি.) কে গ্রেফতার করলো। তাও হাবীব (রাযি.) মুসায়লামাকে বললেন, আমি তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে দাওয়াত দিচ্ছি। তুমি তওবা করে নাও।

মুসায়লামা বললো–

তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, আমি আল্লাহর রাসূল?

হাবীব (রাযি.) বললেন–

বরং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

মুসায়লামা বললো, দেখো, আমার নবুওয়তের সাক্ষ্য না দিলে কিন্তু তোমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

হাবীব (রাযি.) বলেন, কখনো তা সম্ভব নয়, তুমি মিথ্যাবাদী। মুসায়লামা তার কথা বাস্তবায়ন করলো। হযরত হাবীব (রাযি.)-এর একটি হাত কেটে দিলো।

মুসায়লামা আবার বললো, আমার নবী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দাও। হাবীব (রাযি.) এবারও অস্বীকার করলেন।

এবার মুসায়লামা তাঁর দ্বিতীয় হাত কেটে দিল।

মুসায়লামা আবার বললো, আমার নবুয়্যতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দাও।

হাবীব (রাযি.) আবারও অস্বীকার করলেন। এবার তাঁর এক পা কেটে দেওয়া হলো। তবুও হযরত হাবীব (রাযি.) তাঁর ঈমানের উপর অটল, অবিচল।

আবারও একই দাবী, আবারও অস্বীকার, এবার কাটা হলো দ্বিতীয় পা।

আবার একই দাবী, আবারও অস্বীকার, এবার হযরত হাবীব (রাযি.)-এর জিহ্বাটিও কেটে ফেলা হলো।

তবুও তিনি মাথা নাড়িয়ে মুসায়লামার দাবী অস্বীকার করলেন। অবশেষে তাঁর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করে কাটা হলো। হযরত হাবীব (রাযি.) অটল অবিচল ঈমান নিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। এমন কষ্ট দায়ক নৃশংস মৃত্যু কি কেউ সহ্য করতে পারে? আর কোনো মায়ের জন্য তা আরও অসম্ভব।

হযরত উম্মে আম্মারা (রাযি.) কে সংবাদ দেওয়া হলো তাঁর প্রিয় সন্তানের হাত পা জিহ্বা এবং পুরোটা দেহ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে।

হযরত উম্মে আম্মারা (রাযি.) কাঁদলেন না। মাতম করলেন না। শুধু চরম বিষাদে চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি নির্ভিককণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, এই দিনটার জন্যই তো তাকে আমি পান করিয়েছিলাম বুকের দুধ।

এক মহিলার দোয়ায় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিলো

জাহেলী যুগে তালাক দেওয়ার নিয়ম ছিলো এরকম। স্বামী তার স্ত্রীকে বলে দিতো, তুমি আমার মা-বা মায়ের মতো। ইসলামী শরীয়তে একে যিহার বলে। এভাবে বললে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যায়। রুজু বা ফিরিয়ে নেয়া যায় না। ইসলামের প্রথম যুগে এ সম্পর্কিত কোনো বিধান নাযিল হয়নি, নাযিল হয়েছে পরে।

মহিলা সাহাবী হযরত খাওলা বিনতে সালাবা (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দৌড়ে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী যিহার করেছেন। আপনি এটা বাতিল করে দিন। শরীয়তের বিধান যেহেতু তখনও আসেনি, তাই প্রচলিত নিয়মানুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

হ্যাঁ, যিহার করলে তোমার তালাক হয়ে গেছে। হযরত খাওলা বিনতে সালাবা (রাযি.) বলতে লাগলেন, তালাক হয়ে গেলে আমি কোথায় যাবো? আমার কি হবে? কে আমাকে দেখবে?

হায়! আমার বয়স হয়ে গেছে, মা-বা আপনজনেরা চলে গেছে। যৌবন শেষ হয়ে গেছে। অর্থবিত্তও শেষ। যেভাবেই হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তালাক বাতিল করে দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলতে পারলেন না, মাথা নামিয়ে নিলেন, খাওলা বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শুনলেন না আমার কথা। আমি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে শোনাচ্ছি।

টলটলে চোখে তিনি তাকালেন আকাশের দিকে। পরম আস্থা নিয়ে সে দিকে হাত উঠালেন। বড় হৃদয়গ্রাহী শব্দে গভীর আবেগ মিশ্রিত সুরে বলতে লাগলেন।

হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমার ছোট ছোট বাচ্চা আছে। আমার স্বামী না থাকলে এদেরকে খাওয়াবো কোথা থেকে? যদি স্বামীর কাছে রেখে চলে যাই, তবে এরা সৎ মায়ের কবলে পড়ে কষ্ট পাবে। হে আল্লাহ! আপনি আমার পক্ষে ফয়সালার বিধান নাযিল করুন।

তিনি এমন বলেন নি যে আপনি যেমন ইচ্ছা তেমন ফয়সালার বিধান নাযিল করুন বরং বলেছেন আমার পক্ষে বিধান নাযিল করুন।

এরপর ঘটল বিস্ময়কর সেই ঘটনা! আল্লাহ তা'আলা বিধান নাযিল করলেন। শুধু তার জন্যই বিধান নাযিল করলেন। সাধারণভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেননি যে, ঠিক আছে তোমার পক্ষে ফয়সালা করে দিলাম। বরং কোরআনের একটি সূরাই নাযিল করে দিলেন। আটাশ পারার, প্রথম সূরা। পবিত্র কোরআন যতদিন থাকবে, খাওলা বনিতে সালাবা (রাযি.)-এর কাহিনীও এ উম্মত শুনতে থাকবে।

খাওয়ালা বিনতে সালাবার হাত তখনও নিচে নামেনি। কিন্তু তাঁর কান্নায় আল্লাহ পাকের আরশে আযীমের দরজা ততক্ষণে খুলে দিয়েছে। জিবরাইল (আ.) এলেন, বললেন, এক নারীর বেদনাহত আর্জিতে আল্লাহর আরশ দুলে উঠেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী নাযিলের অপার্থিব প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। হযরত আয়েশা (রাযি.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খাওলাকে তিনি বললেন, খাওলা হাত নামাও। ওহী এসে গেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুক্তার দানার মতো চকচকে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, খাওলা! তোমাকে মোবারকবাদ। তোমার রব তোমার পক্ষে ফয়সালা করেছেন। নাযিল করেছেন সূরা মুযাদালাহ্ এর প্রথম দিকের আয়াতগুলো।

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলাা সে নারীর কথা শুনেছেন, যে নারী আপনার (রাসূল) সাথে তার স্বামীর ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করেছে এবং অভিযোগ পেশ করেছে আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেছেন। নিশ্চই আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং দেখেন। (সুরা মুযাদালাহ, ১)

অর্থাৎ আজকের দিন থেকে জাহেলী যুগের প্রচলিত সেই তালাক বাতিল করে দিচ্ছি এবং যিহারের নতুন বিধান নাযিল করছি।

الَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِيْ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মায়ের সাথে তুলনা করে ফেলে, তাদের স্ত্রীরা মূলত তাদের মা নয়। তাদের মা কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। তারাতো গর্হিত অর্থহীন কথাই বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল। (মুযাদালাহ, ২)

এরপর আবার বলা হয়েছে

وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অর্থ: আর যারা স্ত্রীদেরকে স্বীয় মায়ের সাথে তুলনা করে ফেলে, তাহলে তারা নিজেদের সেই উক্তি প্রত্যাহার করে ফেলবে এবং কাফফারা স্বরূপ পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করবে। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সাম্যক অবগত। যদি কেউ এমন দাসমুক্তির সামর্থ্য না রাখে, সে একে অপরকে (স্বামী-স্ত্রী) স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দুই মাস রোজা রাখবে। যে এতেও অক্ষম সে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-৩)

এ আয়াতগুলো যেমন চির অক্ষয় অম্লান হয়ে থাকবে, তেমনি খাওলা বিনতে সালাবা (রাযি.)-ও চির অমর হয়ে থাকবেন। এর একমাত্র কারণ ছিলো খাওলা (রাযি.)-এর ঈমান ও আমল এতই পছন্দনীয় ছিলো আল্লাহ তা'আলাার কাছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে আয়াত নাযিল জরুরী মনে করেছেন।

তাঁর খাতিরে আল্লাহ তা'আলা যিহার সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেছেন। হযরত উমর (রাযি.) একদিন কয়েকজন সহযোগীসহ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এ মহিলার সাথে দেখা। হযরত উমর (রাযি.) দাঁড়িয়ে মহিলার সাথে কথাবার্তা বললেন। মহিলা যখন চলে গেলেন, তখন সাথিরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এ মহিলার জন্য এতগুলো মানুষের পথ আটকে দিলেন? হযরত উমর (রাযি.) বললেন, তোমরা জানো এ মহিলা কে? এ হলো সে মহিলা যার কথা আল্লাহ তা'আলাা সাত আসমানে বসে শুনেছেন। সুতরাং আমি কি তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহর কসম তিনি যদি সেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তাহলে তাঁর সাথে আমি রাত্রি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতাম।

কে না জানে, কত বড় বড় রাণী মহারাণী কাদামাটির নিচে পঁচে গলে গেছে। তাদের নাম নেয়ার মতো কেউ নেই।

তাই বলছি প্রিয় মা বোনেরা–

চিরদিন ঈমান ও আমলের স্মরণই অমর হয়ে থাকে।

অম্লান হয়ে থাকে তাক্বওয়ার কাহিনী।

অক্ষয় হয়ে থাকে সত্যের সাত কাহন।

এক বৃদ্ধা মহিলার নবীপ্রেম

হযরত উমর ফারুক (রাযি.) রাতে পরিদর্শনে বের হয়েছেন। একটি ঘরের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন ওমর (রাযি.)। এক বৃদ্ধা চরকায় সুতা কাটছেন আর গুন গুন করে গাইছেন রাসূলুল্লাহর শানে কবিতা।

হে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।
আজ আপনি নেই, জানি না আপনার স্পর্শ পাবো কিনা।
তবে, মৃত্যু তো আসবেই।
হায়! সেদিন কবে দেখবো,
যেদিন আমি আপনার সাথে থাকবো এবং
জান্নাতে আপনার সাথে যেতে পারব।

হযরত উমর (রাযি.) বাইরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধার আবেগ মিশ্রিত হৃদয়ের আওয়াজ শুনছিলেন। উমর (রাযি.) বৃদ্ধার হৃদয়স্পর্শী কবিতা শুনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। প্রিয় নবীজীর কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে।

কান্নার বেগ ঠেলে বেরিয়ে এলো। কাঁদলেন অনেকক্ষণ। এরপর দরজায় টোকা দিলেন,

ভেতর থেকে বৃদ্ধা জিজ্ঞাস করলেন, কে?

উমর (রাযি.) উত্তর দিলেন, আমি উমর।

এরপর বৃদ্ধা বললেন, উমর! আমার মতো এক গরীব বৃদ্ধার কাছে তোমার কি প্রয়োজন?

উমর (রাযি.) বললেন, দয়া করে দরজা খুলুন।

দরজা খুললেন বৃদ্ধা। উমর (রাযি.) বললেন, আমাকেও আপনার দোয়ার সাথে শরীক করুন। দয়া করে আবার সেই কবিতাটি আবৃত্তি করুন। এরপর বৃদ্ধা আরও আবেগের সাথে আবৃত্তি করলেন সেই কবিতা– উমর (রাযি.) শুনলেন, কাঁদলেন, অনেকক্ষণ।

ফেরাউনের ঘরে ঈমান

এক বাদশা ছিলো ফেরাউন। দুনিয়ার অনেক বড় বড় বাদশাদের একজন। সে নিজের প্রভুত্বের দাবী তুলে নিজেকে খোদা বলে ঘোষণা দিয়েছিলো। তার স্ত্রী হযরত আসিয়া (রাযি.)। এতবড় সম্রাটের স্ত্রী! তার মর্যাদার কি তুলনা চলে?

স্বামী আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করে নিজে খোদা দাবী করেছে। আর তার স্ত্রী সেই আল্লাহর উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়ে গেল। ফেরাউন সেটা সহ্য করবে কিভাবে? ফেরাউন তার স্ত্রী আসিয়াকে তার উপর ঈমান আনতে বললো, সব ধরনের হুমকি দিলো, কিছুতেই কাজ হলো না।

এরপর বিভিন্নধরনের লোভ দেখালো। নরম ভাষায় বুঝালো, গরম ভাষাও ব্যবহার করলো। কিন্তু কিছুতেই কাজ হলো না। অন্তর যখন তার গতিপথ পেয়ে যায়, তার ঠিকানা পেয়ে যায়, তাকে তখন কেউ আর সেখান থেকে ফিরাতে পারে না। অন্তরের গতি পথ তো আল্লাহর পথ, এ অন্তরের ঠিকানা তো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এ অন্তরের অস্তিত্বই এসেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য, এতে আর কারও স্থান নেই।

হযরত আসিয়া বললেন, আমি আমার রবকে চিনতে পেরেছি এই আমার শেষ কথা। এরপর তাঁকে বন্দি করা হলো। নিক্ষেপ করা হলো অন্ধকার কুঠরীতে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সইলেন ঈমানের জন্য। ক্ষুধার কষ্ট, তৃষ্ণার কষ্ট, মুহূর্তের জন্যও কখনও অনুভব করেননি।

আসলে ঈমান এক বিস্ময়কর বিষয়। বিস্ময়কর বিষয় আল্লাহ তা'আলাার প্রতি বান্দার এরকম ভালোবাসাও। নির্যাতনের মাত্রা যতো বাড়তে থাকবে ঈমান ততো মজবুত হবে। ভালোবাসার মাত্রাও ততোই গভীর হবে। এ এক আশ্চর্য বিষয়।

হযরত আসিয়া (রাযি.)-এর উপর ফেরাউনের নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। আর বাড়তে লাগল আল্লাহর প্রতি আসিয়ার ভালোবাসাও। ফেরাউন তাঁকে অন্ধকার কুঠরীতে নিক্ষেপ করছে, আর আসিয়া তখন আল্লাহর মুহব্বতে নিমজ্জিত। অবশেষে ফেরাউন হুকুম দিলো, আসিয়াকে দরবারে নিয়ে এসো। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাদশাদের স্ত্রীদের একজন। তাঁর স্ত্রী জীবনে কোনো দিন একটি আঁচড়ও যার গায়ে লাগেনি। মখমলের গালিচা ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর পা পড়েনি। আজ তাঁকে এখানে চাবুকাঘাত করা হবে। যে দেহ দুধে আলতায় সজ্জিত থাকতো, সে দেহকে এখন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হবে। তাঁর অপরাধ, আল্লাহ ও তাঁর নবী মূসা (আ.) কে ভালোবাসেন।

চাবুক মারা শুরু হলো, এক, দুই, তিন, অগণিত অসংখ্য বার চাবুক আঘাত করছে হযরত আসিয়ার কোমল শরীরে। রক্তের ফোয়ারা ছুটলো, শরীরের চামড়া ফেটে যাচ্ছে, ঝাঝড়া হয়ে যাচ্ছে, মাংস পেশীগুলো থেতলে যাচ্ছে।

আর তিনি বলছেন, আরো মারো, আরো মারো, প্রাণ বের করে নাও। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রতি ভালোবাসায় সামান্যতম চিড় ধরাতে পারবে না বরং আরও মজবুত হবে ভালোবাসার সেতুবন্ধন।

ক্ষত-বিক্ষত হয়ে হযরত আসিয়ার দেহ টলে গেলেও তাঁর ঈমান ছিলো অটল, অবিচল।

এক সময় ফেরাউনের ধৈর্য টুটে গেলো। বিরক্ত হয়ে হুকুম দিলো, একে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও। আর তাঁর চামড়া দেহ থেকে আলাদা করে ফেলো।

হযরত আসিয়া (রাযি.) আকাশের দিকে তাকালেন, আরয করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তো জানোই, আমি এক নারী, যে জন্মগতই বড় দুর্বল। এখন আমি বড়ই অসহায়, আমার স্বামী আমার দেহ থেকে চামড়া তুলে নিতে নির্দেশ দিয়েছে। এ কঠিন যন্ত্রণা কি করে আমি সহ্য করবো। হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাত দেখাও। আমাকে আমার ঘর দেখাও। তোমার প্রতিবেশী বানিয়ে নাও।

বড় আশ্চর্য এক দোয়া! উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, হযরত আসিয়া (রাযি.)-এর দোয়া ছিল বড় আশ্চর্য ধরনের। তিনি প্রথমে আল্লাহ তা'আলাার প্রতিবেশী হতে চেয়েছেন, এরপর জান্নাতের বাসিন্দা।

পবিত্র কোরআনেও এ ব্যাপারে উল্লেখ্য আছে,

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

সূরা আততাহরীম, আয়াত, ১১,।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাা কোরআন মাজিদে ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া (রাযি.)-এর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। আসিয়া বলল, হে আল্লাহ! হে আমার রব! আপনার একান্ত কাছে আমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করুন। ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। জালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

আল্লাহর রহমতের সাগরে আবেগের ঢেউ উঠলো, আসমানের দরজা সমূহ খুলে যেতে লাগলো। আরশের ফেরেস্তাগণ দুলে উঠলেন। আল্লাহ তা'আলাা জান্নাতের এক প্রহরীকে বললেন, আসিয়ার জন্য জান্নাতে আমি একটি ঘর বানিয়েছি, সেই ঘরটি তাকে দেখাও।

হযরত আসিয়া (রাযি.) তাঁর ঘর, চিরস্থায়ী নিবাস দেখলেন। ঠোঁট জোড়া সুন্দর হাসিতে স্ফিত হলো এবং পবিত্র আত্মা চলে গেলো আল্লাহর সান্নিধ্যে।

এ কাহিনী এখানেই শেষ নয়। হাজার হাজার বছর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর চির বিদায় আসন্ন, তিনি বললেন, খাদীজা! তুমি তো এখান থেকে জান্নাতে চলে যাবে, সেখানে তোমার সতীনকে আমার সালাম বলো। হযরত খাদীজা (রাযি.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার পূর্বে আপনার কি কোনো স্ত্রী ছিলো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

জান্নাতী নারী

মোহাম্মদ হোসাইন বাগদাদী (রহ.) বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। একদিন তিনি সদাই কিনতে বাজারে গেলেন। দেখতে পেলেন একটি বাঁদী বিক্রি হচ্ছে। কালো বদ সুরত। তাই ক্রেতা তার আশপাশে ভীড়ছে না। বাদীর মালিক বিষন্ন মনে দাঁড়িয়ে আছে।

হোসাইন বাগদাদী এগিয়ে গেলেন বাদীর নিকট। জিজ্ঞেস করলেন, দাম কতো। বিক্রেতা বলোল, এর মাথায় কিছুটা সমস্যা আছে, নিলে নিতে পারো। দাম নাম মাত্র।

হুসাইন বাগদাদী ভালো করে বাদীকে পরখ করলেন, তার চুলগুলো এলো মেলো হলেও চেহারার মধ্যে পাগলামীর কোনো নিদর্শন পাওয়া গেলো না। বেশ প্রাণবন্ত। হোসাইন বাগদাদী তাকে কিনে নিলেন।

রাত হলো, শুয়ে পড়লেন হুসাইন বাগদাদী, শুয়ে পড়ল বাদীও। অর্ধ রাত পরে চোখ খুলে গেল হুসাইন বাগদাদীর। ঘরের মধ্যে একটি মানব অবয়ব তার নজরে পড়ল, ভালো করে খেয়াল করে দেখলেন, সেই বাদী জায়নামাযে বসে অঝোড় ধারায় কাঁদছে। আবার কথাও বলছে কার সাথে যেনো। হঠাৎ সে বলতে লাগল,

হে আল্লাহ! আমার প্রতি তোমার যে ভালোবাসা আমি এর উসিলায় বলছি। একথা বলেনি, আপনাকে আমি যে ভালোবাসি, তার উসিলা দিয়ে বলছি, এটা বলাই উচিত ছিল। একথা শুনে মুহাম্মদ হুসাইন বাগদাদী বললেন, আরে আল্লাহর বাঁদী। একি বলছো তুমি! বরং বলো হে আল্লাহ! আমি যে তোমাকে ভালোবাসি, এর উসিলা দিয়ে বলছি।

বাঁদী বলে উঠলো, হুসাইন বাগদাদী! খামোশ হয়ে যাও। আমি যদি তাঁর প্রিয় না হতাম, আমাকে যদি তিনি ভালো না বাসতেন, তাহলে এই রাতে এখানে দাঁড় করাতেন না। আর তোমাকে এখানে শায়িত রাখতেন না। আমার জন্য তাঁর প্রেম আছে বলেই তিনি আমাকে জায়নামাযে এনে দাঁড় করিয়েছেন।

যদি তোমার প্রতি প্রেম থাকতো, তাহলে তোমাকেও এখানে এনে জায়নামাযে দাঁড় করাতেন। তোমাকে সেখানে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন না।

এরপর বাঁদী আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, হে আল্লাহ! এতদিন তোমার আমার সম্পর্কের কথা কেউ জানত না, গোপন ছিলো, এখন লোকদের মাঝে এটা প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই আমাকে তোমার কাছে উঠিয়ে নাও।

এর সাথে সাথেই সে একটি চিৎকার দিয়ে পড়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা সত্যিই তাঁকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।

মুহাম্মদ হুসাইন বাগদাদী (রহ.) বলেন, ঘটনার আকস্মিকতায় আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম এবং বিস্মিতও হলাম।

সকালে তাঁর কাফন কেনার জন্য বাজারে গেলাম, এসে দেখি সবুজ রেশমের কাপড় দিয়ে তাঁকে কাফন পরিয়ে রাখা হয়েছে, কাফনের উপর লেখা রয়েছে।

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

অর্থ: শুনে রাখো, যারা আল্লাহর বন্ধু আল্লাহ যাদের প্রেমাস্পদ তাদের কোনো ভয় নেই, দুঃখ নেই, দুশ্চিন্তা নেই। (সূরা ইউনুস, আয়াত-৬২)

হযরত সুফিয়ান সাওরীর মা

বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.)-এর বাল্য কালের ঘটনা। তিনি তাঁর মাকে বলতে লাগলেন; মা আমাকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দাও। আমাকে আল্লাহর নামে ওয়াক্ফ করে দাও।

ওয়াকফের বিধান হলো, যে জিনিস একবার ওয়াক্ফ করা হয়, তা আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না।

মা বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমাকে আল্লাহর নামে ওয়াক্ফ করে দিলাম।

হযরত সুফিয়ানে সাওরী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস হয়ে ফিরে এলেন উনিশ বছর পর। ঘরে পৌছলেন রাতের বেলা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। টোকা দিলেন দরজায়। মা ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে?

তিনি জবাব দিলেন, তোমার ছেলে সুফিয়ান মা।

উনিশ বছর পর যে মা সন্তানের আওয়াজ শুনেছেন, সে মায়ের কি অবস্থা হওয়ার কথা? কতটা আনন্দে আত্মহারা হওয়ার কথা? কেমন আকুল হয়ে দরজার দিকে ছুটে যাওয়ার কথা? কেমন ব্যাকুল হয়ে সন্তানের বুকে ঝাপিয়ে পড়ার কথা? এক আকাশ আবেগে তো মায়ের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। তার হৃদয় জগত স্নেহ মমতার ঝড়ে লন্ড ভন্ড হয়ে যাওয়ার কথা। দুই চোখ অশ্রু বন্যায় প্লাবিত হওয়ার কথা। গভীর আবেগে আপ্লুত হয়ে বাবা বলে চিৎকার করে ছেলেকে বুকে তুলে নেয়ার কথা।

কিন্তু এই মায়ের হৃদয় জগতে কোনো তোলপাড় হলো না। নিস্তব্দ রাতের মতো নীরব হয়ে রইল। তার ভেতর আবেগের ঝড় তো উঠলোইনা, মৃদু আলোড়ন ও উঠলনা।

তিনি সেখানে বসে নিরাবেগ কণ্ঠে বলেন, বেটা! তোমাকে আল্লাহর নামে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলাম। আর যে জিনিস ওয়াক্ফ করে দেওয়া হয়, তা ফিরিয়ে নেয়া যায় না। বরং তা অসম্মানের কথা। তুমি দরজা থেকেই ফিরে যাও। আমি কেয়ামতের দিন তোমার সাথে সাক্ষাত করবো, এর আগে নয়। তিনি ছেলেকে দরজার ফাঁক দিয়ে একবারও দেখতে চাইলেন না।

কি বিস্ময়কর ধৈর্যের অধিকারী মা! ত্যাগের কতবড় দীক্ষা দিয়ে গেলেন মুসলিম জাতিকে।

এরপর ছেলে সুফিয়ান সাওরী (রহ.) কি বললেন? তিনি তো বলতে পারতেন, মা আমাকে তুমি পড়ালেখার জন্য ওয়াক্ফ করেছিলে। আমি তো দ্বীনী ইলম পূর্ণাঙ্গরূপে শিক্ষা করে ফিরে এসেছি। তোমার ওয়াক্ফের দায় শেষ করে এসেছি। ঠিক আছে তোমাকে মাত্র এক পলক দেখে ফিরে যাবো।

কিন্তু সুফিয়ান সাওরী এসব কিছুই বললেন না। যেমন মায়ের তেমন ত্যাগী সন্তানের মতো তিনি ফিরে গেলেন।

এরপর সুফিয়ান সাওরী (রহ.) এমন বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তাঁর সময়কার খলীফা ছিলেন, আবু জাফর মনসুর। তার জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে মক্কায় সুফিয়ান সাওরী ফতোয়া দিয়েছিলেন। খলীফা মনসুর তা শুনে মক্কার গভর্নরের কাছে ফরমান পাঠান, যেন সুফিয়ান সাওরীকে আটক করা হয়। তাঁর জন্য ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করারও নির্দেশ দিলেন এবং বললেন খলীফা মনসুর এসে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলাবেন।

তিনি তখন হাতীমে কাবাতে ছিলেন। আরেক মনিষী ফুযাইল ইবনে আয়াযের কোলে মাথা রেখে তিনি শুয়েছিলেন।

এ সময় আরেক মনিষী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) ছুটে এসে বললেন, সুফিয়ান! জান বাঁচাও-পালাও।

সুফিয়ান সওরী (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, কেনো?

ইবনে উয়াইনা বললেন, খলীফা মনসুর তোমার নামে ফরমান জারি করেছে, তোমাকে গ্রেফতার করতে। খলীফা এসে তোমাকে শুলিতে চড়াবেন।

সুফিয়ান সাওরী জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি তিনি একথা বলেছেন? ইবনে উয়াইনা বললেন, হ্যাঁ সত্যি বলেছেন এবং তিনি মক্কায় আসছেন।

সুফিয়ান সাওরী (রহ.) অস্থির হলেন না। ধীরে ধীরে উঠে মুলতাযামা নামক খুটির দিকে এগিয়ে গেলেন। খুটি ধরে তিনি বলতে লাগলেন;

হে আল্লাহ! তুমি মনসুরকে মক্কায় ঢুকতে দিয়োনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন মর্যাদার অধিকারী লোক সব সময়ই পৃথিবীতে আগমন করবে। যাঁরা আল্লাহর নামে কসম খেলে আল্লাহ তা'আলা সেই কসম অবশ্যই পূর্ণ করে দেবেন।

খলীফা আবু জাফর মনসুর তায়েফের পাহাড় অতিক্রম করলেন, আর মাত্র কয়েকশত গজ সামনে মক্কা। কিন্তু তায়েফের পাহাড় অতিক্রম করার পর এক কদমও এগুতে পারলেন না। সেখানেই আচমকা পড়ে গেলেন এবং মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করলো। মক্কার সীমানায় ঢুকতে পারলেন না। আজ খলীফা আবু জাফর মনসুর-এর কবরের নাম নিশানাও নেই।

বখতিয়ার কাকীর ঘটনা

হযরত বখতিয়ার কাকী (রহ.) প্রখ্যাত এক আল্লাহওয়ালা। বয়স যখন সাত বছর, তখন তাঁর মা তাঁকে বাড়ির পাশে মাদ্রাসায় পাঠালেন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য।

শিক্ষক তাঁকে পড়াতে শুরু করলেন, বলো ছেলে, আলীফ, বা, তা, সা. এরপর বখতিয়ার কাকী আলীফ তো বললেনই সাথে সাথে শুরু করলেন সূরা ফাতেহা, এরপর আলীফ লাম মীম. যালিকাল কিতাবু লারাইবা ফীহ। পড়তে পড়তে পড়তে পনের পারা শিক্ষককে শুনিয়ে দিলেন। এমন শ্রুতিমধুর তেলাওয়াত যে, শিক্ষক বাঁধাও দিতে পারলেন না। তন্ময় হয়ে শুনলেন।

এরপর শিক্ষক বললেন, আরে ছেলে! তোমার মা তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে রসিকতা করলেন কেন? আর তুমিই বা এমন শিশু বয়সে অর্ধেক কোরআন শরীফ মুখস্ত করলে কিভাবে? বিস্ময়ে শিক্ষকের মুখে আর কোনো কথা আসে না। শিশু বখতিয়ারও এ বিষয়ে কোনো উত্তর দিতে পারে না।

শিক্ষক তাঁর শিশু ছাত্রকে নিয়ে মায়ের কাছে গেলেন। পর্দার আড়ালে থেকে বললেন, আপনি আমার সাথে এরকম বিদ্রুপ করলেন কেনো? আপনার ছেলে পনের পারা হাফেজ। সে কত ছোট। এ বয়সে পনের পারা হেফজ করল কিভাবে? অথচ আপনি তাকে আলিফ, বা, পড়ানোর জন্য আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

মা বললেন, দেখুন সম্মানিত উস্তাদ। যদি আমি জানতাম আমার ছেলে পনের পারা হাফেজ, তাহলে কি আমি তাকে আপনার কাছে পাঠাতাম? আমি তা আজ প্রথম জানতে পারলাম। আল্লাহ তা'আলাা তাকে শিশু বয়সে পনের পারা কোরআন মুখস্ত করিয়েছে। সত্যি এটা বড়ই বিস্ময়কর ঘটনা।

যে কেউ শুনবে, সেই একথা বলবে। কিন্তু আমার কাছে এটা কোনো বিস্ময়কর ঘটনা নয়। কারণ, আমার মনে পড়ছে, আমি যখন তাকে দুধ পান করাতাম তখন মৃদু শব্দে ধীরে ধীরে কোরআন তেলাওয়াত করতাম। এজন্য আল্লাহর অপার করুণায় আমার তেলাওয়াত এর হৃদয়মানসে অঙ্কিত হয়ে যায়।

মু'আয আদাবিয়ার বিস্ময়কর ইবাদত

হযরত মু'আয আদাবিয়া (রহ.) বিখ্যাত এক মহীয়সী নারী। রাত হলে তিনি নিজেকে বলতেন, হে মুয়ায! এই তোমার শেষ রাত। কাল তুমি সূর্যের আলো আর দেখতে পাবে না। যা কিছু করার করে নাও। এটা বলে সমস্ত রাত জায়নামাযে বসে কাটিয়ে দিতেন, ঘুম আসলেও জায়নামায ছাড়তেন না। দিনের বেলা সামান্য সময় ঘুমিয়ে নিতেন। পরের দিন আবার নিজেকে বলতেন, হে মুয়ায এটাই তোমার শেষ রাত। কালতো আর সূর্যের আলো দেখবে না। যা কিছু করার এ রাতেই করে নাও, এরপর সমস্ত রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন।

তাঁর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন কিছুক্ষণ তিনি কাঁদলেন, এরপর আবার হাসলেন, উপস্থিত এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেনো? আপনার মত এত বড় আল্লাহর ওলীর তো চিন্তার কিছু নাই। তিনি বললেন, কাঁদছি এজন্য যে, আজকের দিনের পর তো আর নামায পড়তে পারব না। সব ইবাদত থেকেই বঞ্চিত হব। এই দুঃখে আমার কান্না আসছে। আর হাসলাম, এজন্য যে, আমার স্বামী সালতা ইবনুল আসীম আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, বলছেন, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তাঁর সাথে আবার আমার মিলন হতে যাচ্ছে। এ আনন্দে আমি হেসেছি। একথা বলতে বলতে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেলো।

মু'আয আদাবিয়ার স্বামী হযরত সালতা ইবনুল আসীম (রহ.) ছিলেন অনেক বড় বুযুর্গ তাবেঈ। তুর্কিস্তানের জেহাদে গিয়ে তিনি শাহাদাত লাভ করেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মায়ের তাকওয়া

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইসলামের ইতিহাসে সোনালী মহা পুরুষ। মক্কার বাসিন্দা। ইমাম মালিক (রহ.)-এর কাছে ইলমেদ্বীন শিক্ষার জন্য তিনি সুদূর মদীনায় গিয়েছিলেন। তখন তিনি ছিলেন সহায় সম্বলহীন মানুষ। দু'টি পুরোনো চাঁদর ছাড়া সম্বল বলতে আর কিছুই ছিল না তাঁর কাছে। ঘরে রেখে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা মাকে। মা তাঁকে ভীষণ আদর করতেন। তাই বলে তিনি ছেলেকে ঘরে বসিয়ে রাখলেন না। তাঁকে তিনি মদীনায় পাঠালেন ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যখন হযরত ইমাম মালেক (রহ.)-এর ছাত্র, তাঁর মায়ের মজবুত আকাঙ্খা ও দৃঢ়চেতা ঈমানী মনোবল হেতু, তিনি

তাঁকে ইমাম মালেক (রহ.)-এর দরসে ইলম শিখতে পাঠিয়ে ছিলেন। এক সময় পড়াশোনা শেষ হলো ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর। এরপরও তিনি উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য মালেক (রহ.)-এর দরবারে থেকে গেলেন।

কিন্তু তাঁর মন হারিয়ে যেতে সুদূর মক্কায় অজো পাড়াগায়ে ফেলে আসা মমতাময়ী মায়ের কাছে। এই চিন্তায় তিনি খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। মায়ের পবিত্র মুখখানা দেখার জন্য তিনি অস্থির হয়ে পড়েন।

ধীরে ধীরে তাঁর সে অস্থিরতা বেড়েই চললো। একদিন তিনি ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে বললেন, আমার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে বাড়িতে রেখে আসা আমার বৃদ্ধা মায়ের খেদমতে হাজির হতে। আমি আমার মন স্থির রাখতে পারছি না। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে তাঁর খেদমতে হাজির হওয়া দরকার। আমি আমার ইচ্ছার ব্যাপারে আপনার অনুমতি কামনা করছি।

একথা শুনে ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, তুমি খুব দ্রুত তোমার মায়ের কাছে চলে যাও এবং এক্ষুণি সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

হুকুম পেয়ে শাফেয়ী (রহ.) তৎক্ষণাত প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। এ দিকে তাঁকে প্রস্তুতি নিতে দেখে মালেক (রহ.) একজন লোককে তাঁর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যাতে তাঁর মায়ের কাছে অগ্রিম সংবাদ পৌঁছে দিতে পারে। দূত সংবাদ দিলো শাফেয়ী (রহ.)-এর মাকে যে আপনার সন্তান শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী হয়ে অনেক বড় আলেম হয়েছেন, তিনি আগামীকাল বাড়িতে আসছেন।

এক সময় ইমাম শাফেয়ী রহ.)-এর প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। খুব জাঁক-জমক অবস্থায় অত্যন্ত আড়ম্বরতার সাথে তিনি নিজ ভূমি মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর পেছনে ছিলো খোরাসানী ঘোড়া আর মিশরী গাধা। এগুলোর পিঠে ছিল কাপড় বোঝাই করা দিনার দিরহাম। আরও রকমারী আসবাবপত্র। এভাবে বেশ কয়েকটি ঘোড়া আর গাধা বোঝাই করে তিনি মক্কার পানে এগিয়ে চললেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এগিয়ে চলেছেন। একদিন দুই দিন, পথ যেন আর ফুরায় না। সারা পথ তাঁর মনে ভাসছিল মক্কার অলি গলি আর মাঠ। আর বৃদ্ধা মায়ের মলিন মুখ। যে মুখে আজ হাসি ফুটবে। এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় তিনি প্রবেশ করলেন হেরেম শরীফের সীমানার মধ্যে।

ঠিক তখনই তাঁর চোখে পড়ল এক অভাবনীয় দৃশ্য। তিনি দেখলেন, কতগুলো মহিলা তাঁর অপেক্ষায় দাড়িয়ে। এর মাঝে লক্ষ্য করে দেখলেন, দুর্বল ও বৃদ্ধ মা ছেলের অপেক্ষায় তাঁর মায়াভরা স্নেহের কোল সম্প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দ্রুত এগিয়ে গেলেন মায়ের কাছে।

ঝাপিয়ে পড়লেন বহু দিন ধরে শূন্য মায়ের বুকে। মা তাঁকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আনন্দ অশ্রু বিসর্জন দিলেন। এরপর বৃদ্ধ খালা এগিয়ে এসে তাঁকে স্নেহের চুমু খেলেন। আর কাঁদলেন অভাবনীয় আবেগে। এরপর একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। যার অর্থ হলো এই–

মউতের উত্তাল ঢেউ আজো তোমার মাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি।

আজ প্রতিটা মাতৃ হৃদয়ে তোমার জন্য স্নেহ মমতা পঞ্জিভূত আছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) নিজ মৃতভূমিতে পা দিয়ে হৃদয় নিংড়ানো এ ভালোবাসা পেয়ে মনের ভেতর ভীষণ আশ্চর্য ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হলো। ইতেমধ্যে তাকে ঘিরে অনেক নারী পুরুষ এবং ছোট ছোট শিশুদের ভিড় লেগে গেছে। তাদের সাথে আলাপ আলোচনা ও কুশল বিনিময় করতে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হলো। এ সময় সবাই হাসি-খুশী থাকলেও শাফেয়ী (রহ.)-এর মায়ের চেহারায় ছিল বিষন্নতার ছাপ। তিনি চিন্তিত। বিষয়টা তাঁকে ভাবিয়ে তুললো। সামনে মায়ের কাছে এগিয়ে গেলেন শাফেয়ী (রহ.)। মাকে বললেন, মা চলুন সামনের দিকে যাই। কিন্তু তাঁর মা তাঁর কথা শুনে একটা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন। এরপর বললেন, বেটা! কোথায় যাবে?

শাফেয়ী (রহ.) বললেন, বাড়িতে যাব।

মা তখন বললেন, বেটা! তোমার কি স্মরণ নেই– আমি যখন তোমাকে ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলাম। তখন আমার কাছে দু'টি চাদর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইলমে দ্বীনের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে সে চাদর দু'টিই আমি তোমাকে দিয়ে বিদায় দিয়েছিলাম এবং তোমার অবস্থা এমন ছিলো যে, তুমি ছিলে দুস্থ- ফকীর অসহায় ব্যক্তি।

আর তোমার আমার মনে তখন এই আকাঙ্খা বিরাজ করছিলো যে তুমি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু বেটা! তুমি ইলমে হাদীসের সম্পদ তো এনেছো ঠিকই, কিন্তু তার সাথে যে সব ধন সম্পদ এনেছো, তাতো অহংকারের সমান। তুমি কি

তোমার সম্পদ এজন্য এনছো যে তোমার চাচাতো ভাইদের উপর বড়ত্ব প্রকাশ করবে? তাদেরকে তোমার তুলনায় হীন ভাববে?

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) মায়ের মুখ থেকে এ আশ্চর্য ধরনের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর মায়ের নূরানী চেহারা দেখে ভাবতে লাগলেন, আল্লাহু আকবার! দুনিয়ার সম্পদের প্রতি এ কেমন আশ্চর্য ধরনের অনিহা! ইলমে দ্বীনের একেমন বেনযীর মূল্যায়ন। আর আল্লাহ পাকের প্রতি এ কেমন সীমাহীন ভরসা।

এ আশ্চর্য ঘটনায় শাফিয়ী (রহ.) মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার তীব্র আবেগে কেঁদে ফেললেন। শাফেয়ী (রহ.)-এর দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে, তিনি যা কিছু লাভ করেছেন, তা তাঁর মায়ের পবিত্র বিশ্বাস, আন্তরিক দায়া আর উন্নত ধ্যান-ধারণার কারণেই লাভ করেছেন।

তিনি অনুভব করলেন, বছরের পর বছর পড়ালেখা আর দ্বীন শিক্ষার কাজে বিদেশে কাটিয়ে দেওয়ার পরও আজ তিনি মায়ের কাছে থেকে সে শিক্ষা পেলেন, এতদিন তিনি যে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাই তিনি শ্রদ্ধাও ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ মায়ের হাতে চুমু খেলেন।

এরপর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মায়ের খেদমতে আরজ করলেন, মা এখন কি করব?

মা তখন বললেন, বেটা কি আর করবে? শহরে, গ্রামে ঘোষণা করে দাও। অসহায় দুস্থ লোকেরা এসো। যার খাবার নেই, খাবার নিয়ে যাও। যার কাপড় নেই কাপড় নিয়ে যাও। এমনভাবে যার যা কিছুর অভাব আছে, আমার এখান থেকে নিয়ে তার অভাব পূরণ করে নাও।

এরপর মায়ের নির্দেশ পেয়ে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সাথে সাথে সাধারণ ঘোষণার কথা জানিয়ে দিলেন। আর ক্ষণিকের মধ্যেই লোকজন আসতে শুরু করলো এবং তাঁর সাথে নিয়ে আসা বিশাল ধনভাণ্ডার গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হয়ে গেলো। এখন তার কাছে অবশিষ্ট রইলো পথ চলার জন্য একটি খচ্চর আর পনেরটি দীনার। এভাবেই তাঁরা মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে এক সময় ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর হাত থেকে লাঠিটা নিচে পড়ে গেলো। সে পথ ধরে চাকরানী পানির মশক নিয়ে যাচ্ছিলো, লাঠিটা পড়ে যেতে দেখে সে তা উঠিয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে তাঁর হাতে তুলে দিলো।

চাকরানীর আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে ইমাম শাফেরী (রহ.) তাকে বখশিস দেওয়ার জন্য পকেট থেকে পাচটি দীনার বের করলেন। তাঁর মা তা দেখে বললেন, বেটা! এ পাঁচটি দীনারই কি তোমার কাছে বাকি ছিলো?

শাফেয়ী (রহ.) বললেন, না আম্মাজান, আমার কাছে আরও দশ দিনার আছে।

মা বললেন, আচ্ছা বেটা! সে দশ দীনার কি জন্য রেখেছো? শাফেয়ী (রহ.) উত্তর দিলেন, মা এজন্য রেখেছি যাতে প্রয়োজনের সময় কাজে আসে। মালপত্র খাবার-দাবার যা এনেছিলাম, সবই তো বিতরণ করে দিলাম, হয়ত এ দশ দীনারই আজ আমাদের কাজে লাগবে।

মা তখন বললেন, বেটা! দশটি দীনারের উপর তোমার এত ভরসা! অথচ যিনি সব কিছু দিয়ে থাকেন তাঁর উপর ভরসা নেই। বের করো যত দীনার আছে পকেটে। সব এ চাকরাণীকে দিয়ে দাও।

এরপর শাফেয়ী (রহ.) মায়ের নির্দেশমতো সবগুলো দীনার ঐ চাকরাণীকে দিয়ে দিলেন। এখন তাঁর হাত ও পকেট একেবারেই শূন্য। কিন্তু তাঁর অন্তর এখন এত প্রাচুর্যময় ও ধনী, এর আগে এমনটি কখনও হয়নি।

এরপর শাফেয়ী (রহ.)-এর মা আল্লাহর দরবারে, শুকরিয়া আদায় করলেন এবং অত্যন্ত স্নেহমাখা কণ্ঠে শাফেয়ী (রহ.) কে বললেন, বেটা! এবার তুমি সেই অবস্থাতেই নিজের জীর্ণ কুটিরে প্রবেশ করো। যে অবস্থায় একদিন তুমি এখান থেকে বের হয়েছিলে। কিন্তু আজ আমি আমার এই ঝুপড়ির মাঝে সে রোশনী লাভ করব যা আগে কখনও লাভ করিনি। তিনি আরও বললেন, বেটা! আল্লাহপাক তোমার পেশানিতে ইলমের নূর দান করেছেন, আমি চাইনা দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের দ্বারা তা কলংকিত হোক।

মা বললেন, বেটা তোমার কি সে কথা স্মরণ নেই? তোমাকে বিদায় দেওয়ার কালে আমি তোমার জন্য এ দোয়া করেছিলাম যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার সন্তানকে ইলমের আকাশের সূর্য বানিয়ে উদিত করে দাও। বেটা আমি চাইনা দুনিয়ার এসব সামান্য ধন-সম্পদের কারণে সে সূর্যের আলো কিছুটা ম্লান হয়ে যাক এবং ইসলামী জগত তার পরিপূর্ণ আলো থেকে বঞ্চিত হোক।

ক্ষুধা

হযরত আসমা (রাযি.) বিখ্যাত মহিলা সাহাবী। হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর বড় বোন। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর কন্যা। হযরত জুবায়ের (রাযি.)-এর স্ত্রী। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রাযি.)-এর মা।

সবকিছুতেই এত বিশাল পরিচয় ছিলো। কিন্তু ক্ষুধা আর দরিদ্রতা তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিলো। দিনের পর দিন ঘরে চুলা জ্বলত না। হযরত আসমা (রাযি.) নিজেই বলেন, ক্ষুধা আর দরিদ্রতা ছিলো আমাদের সব সময়ের সাথী। একদিন আমাদের প্রতিবেশী ইহুদী পরিবারে বকরী জবাই হলো, তাদের ঘরে যখন ঘোশত রান্না হচ্ছিল, সেই ঘ্রাণে আমি অস্থির হয়ে গেলাম। আমি আগুন আনার জন্য বাহানা করে এই বাড়িতে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আগুন আনার বাহানায় যাই, সে হয়ত আমাকে এক দু'টুকরা গোশত খেতে দেবে।

কিন্তু ইহুদী মহিলা আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। আমার হাতে শুধু আগুন দিয়ে দিলো। আমি আগুন নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। অথচ আমার ঘরে রান্না করার মত কিছুই ছিল না। আগুন দিয়ে আমি কি করি? আগুন ফেলে দিলাম। কিন্তু কোনো ভাবেই ক্ষুধা আমাকে ধৈর্য ধরতে দিল না। আমি আবার আগুন আনতে তাদের ওখানে গেলাম। পূর্বের মতই ইহুদী মহিলা আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস না করে হাতে আগুন তুলে দিলো। আবারও ঘরে এসে আমি আগুন ফেলে দিলাম। কিন্তু ক্ষুধার যাতনায় আমি কোনো ভাবেই স্থির থাকতে পারছিলাম না।

এ দৃশ্য আল্লাহ পাক দেখছিলেন। অথচ হযরত আসমা (রাযি.) চাইলে তাঁর স্বামীর কাছে অধিকার দাবী করতে পারতেন। যদি নিজের সুখের কথা বলে স্বামীকে কাছে রেখে দিতেন, তাহলে হযরত যুবায়ের (রাযি.) জান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গী হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারতেন না।

এখন প্রশ্ন হলো হযরত যুবায়ের (রাযি.) যখন নবীর সঙ্গী হয়ে জান্নাতে যাবেন, তখন হযরত আসমা কি তাঁর সাথে যাবেন না? নিশ্চই তিনিও তাঁর সাথী হবেন। দেখুন কত বুদ্ধিমতী নারী। দুনিয়ার সামান্য সুখ, ভোগ বিসর্জন দিয়ে কত বড় কত মূল্যবান সম্পদ গড়ে তুলেছেন।

হযরত আসমা (রাযি.) বলেন, ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে তৃতীয়বার ইহুদীর বাড়িতে যেতে বাধ্য করল। এবারও মহিলা আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না, আমার হাতে আগুন তুলে দিল। আমি আগুন

নিয়ে ঘরে ফিরে এসে বসে পড়লাম। দুঃখে কেঁদে দিলাম।

আল্লাহকে বললাম, হে আল্লাহ! এই দুঃখ-বেদনার কথা কাকে বলব। আমার সামনে একমাত্র তুমিই, তোমাকে ছাড়া আর কার কাছে বেদনার কথা বলব?

এবার আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ তাঁর প্রতি উথলে উঠল। প্রতিবেশী ইহুদী মহিলার স্বামী খানা খাওয়ার জন্য বাড়িতে আসল। গোশতের পেয়ালা তার সামনে রাখা হল। সে জিজ্ঞেস করল, আজকে আমাদের ঘরে কি কোনো লোক এসেছিল? স্ত্রী উত্তর দিল হ্যাঁ একজন মহিলা তিন বার এসেছিল আগুন নিতে। স্বামী বলল, আমি পরে খাব। তুমি সে মহিলার ঘরে এক পেয়ালা গোশত দিয়ে আসো।

হযরত আসমা (রাযি.) বলেন, বাইরে গোশতের বাটি হাতে এক ইহুদী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে! আর আমি ঘরে বসে কাঁদছি। আমি কাঁদছি, আর বলছি হে আল্লাহ! আমি কি করব? হে আল্লাহ! আমি কি করব? হে আল্লাহ! আমি কি করব?

এরপর সে ইহুদী মহিলা গোশতের বাটি আমার সামনে রাখল। হযরত আসমা (রাযি.) বলেন, তখন এই গোশতের বাটিটা আমার কাছে সমগ্র দুনিয়ার চাইতেও বেশি মূল্যবান ছিল।

আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা সবার উপরে

হযরত আতেকা (রাযি.) ছিলেন খুবই রূপবতী রমণী। কবিতা চর্চায় খুবই ছিলেনপারদর্শী, বিয়ে হয়েছিল হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু বকরের সাথে। তিনি হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর ছেলে। দেখতে খুবই সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন। বাইশ বছরের যুবক, স্ত্রীর ভালোবাসায় এতই মত্ত ছিলেন যে, আল্লাহর রাস্তায় সময় দিতে অলসতা করতে লাগলেন। ঘরে সুকণ্ঠি রূপবতী স্ত্রী হযরত আতেকা (রাযি.)। স্ত্রীর ভালোবাসা হযরত আবদুল্লাহকে ঘর ছাড়তে দিচ্ছিল না। হযরত আতেকা (রাযি.) আবদুল্লাহকে আল্লাহর পথে বের হতে পিড়া-পিড়ি করে শেষে চুপ হয়ে যান। কারণ, তিনি জানতেন, আমার ভালোবাসার টানে সে যদি ঘরে বসে দিন কাটায়, তাহলে আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহী করতে হবে।

অনেকদিন এ অবস্থা চলছিল। ব্যাপারটা হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর দৃষ্টিতে পড়লো। তিনি ছেলেকে বললেন, বেটা! স্ত্রীর মোহব্বত

তোমাকে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে বাঁধা দিচ্ছে। তুমি তোমার ফরয দায়িত্বে অবহেলা করতে শুরু করেছ। পৃথিবীতে কি তুমি ঘরে বসে থাকার জন্যই এসেছো? অবশ্যই নয়। দ্বীনের দাওয়াত সমস্ত পৃথিবীতে পৌঁছে দিতে হবে। তোমার স্ত্রী তোমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য সহযোগী নয়। যার ভালোবাসা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে নিরুৎসাহিত করছে তাকে তালাক দিয়ে দাও।

আবদুল্লাহ (রাযি.) একথা শুনে ভেঙ্গে পড়লেন। হযরত আতেক (রাযি.)-এর প্রতি এত ভালোবাসা ছিল যে, তিনি তালাক দেওয়ার সাহস করতে পারলেন না।

কিন্তু তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রাযি.) এমন পিতা, যার কথায় তালাক হয়ে যায়। তাছাড়া পিতাকে অসন্তুষ্ট করা যাবে না। পিতা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহর রাসূল অসন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহর রাসূল অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন। তখন তিনি সব ভাবনা বাদ দিয়ে পিতার কথাই প্রাধান্য দিলেন। নিজের বুকভরা প্রেম ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিলেন।

তালাক দেওয়ার পর হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) বিচ্ছেদ বেদনায় এতটাই ভারাক্রান্ত হলেন যে, তা দেখে আবু বকর (রাযি.) নিজেও ভাবনায় পড়ে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) একদিন স্ত্রীর বিচ্ছেদ সইতে না পেরে মনের কষ্ট হালকা করার জন্য একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন,

أَعَاتِكَتَ قَلْبِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
إِلَيْكَ بِمَا تَخْفِي النُّفُوْسِ مُعَلَّقِ

হে আতেকা! যতদিন পৃথিবীতে সূর্য থাকবে, যতদিন সূর্যের উদয় অস্ত থাকবে, তোমার সে প্রিয় মুখচ্ছবিটি আমার স্মৃতি পটে আজকের মতোই স্পষ্ট হয়ে থাকবে। মৃত্যুও তোমার চিন্তা থেকে আমাকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

এই সময় আবু বকর (রাযি.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছেলের এ অবস্থা দেখে বললেন, বেটা! তুমি স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনো। পিতার অনুমতি পেয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু এরপর থেকে কোনো দিন স্ত্রীর ভালোবাসা হযরত আবদুল্লাহকে দ্বীনের কাজে বাঁধা দিতে পারে নাই। স্ত্রী আতেকা (রাযি.) স্বামীকে উৎসাহ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় পাঠিয়ে দিলেন।

তায়েফের জিহাদে হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর বুকে তীর বিদ্ধ হয়, আর এ আঘাতেই মদীনায় এসে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তখন তিনি ছিলেন, মাত্র ত্রিশ বছরের যুবক। স্ত্রী হযরত আতেকা (রাযি.)ও তখন যুবতী। উভয়ের প্রেম ভালোবাসার গভীরতা ছিল তুলনাহীন। কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসা সব ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে বিজয় লাভ করল।

হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর ঘটনা

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পেলেন, হযরত ফাতেমা (রাযি.) গুরুতর অসুস্থ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে গেলেন। হযরত ফাতেমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, মা আমার সাথে আরেকজন মেহমান আছে। হযরত ফাতেমা (রাযি.) বললেন, আব্বাজান, আপনি সাথীকে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু আমার ঘরে তো পর্দা করার মত কাপড় নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যার কথা শুনে কাঁধে থাকা চাদর বাড়িয়ে দিলেন, বললেন, মা চাঁদর দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করো। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যার ঘরে প্রবেশ করলেন।

হযরত ফাতেমা (রাযি.) পিতাকে বললেন, আব্বাজান, আগে ছিল ক্ষুধার কষ্ট, এখন তার সাথে যোগ হয়েছে রোগের কষ্ট। ক্ষুধা নিবারণের জন্য আটা নেই, রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ নেই।

হযরত ফাতেমা (রাযি.) কাঁদতে লাগলেন। কন্যার কথা শুনে আল্লাহর নবীর দুই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। যে নবী তায়েফের জনপদে কাফেরদের পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে কাঁদেননি। উহুদ প্রান্তরে শত্রুর আঘাতে দাঁত মোবারক হারিয়েও কাঁদেননি, তিনি কন্যার ক্ষুধার কষ্ট, অসুখের কষ্টের কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন।

কি হৃদয়বিদায়ক দৃশ্য দেখুন! দোজাহানের বাদশা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তাঁর কন্যা জান্নাতী নারীদের সরদার সাইয়্যেদা ফাতেমা (রাযি.) দুজনেই কাঁদছেন। একদিকে কন্যা কাঁদছেন দুঃখ-কষ্টের কথা বাবাকে বলে, আরেক দিকে আল্লাহর নবী কাঁদছেন কন্যার দুঃখ কষ্টের কথা শুনে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যাকে বললেন, শোনো ফাতেমা! আমার আদরের কন্যা। সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্য

সহ প্রেরণ করেছেন। আজ তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, এর মধ্যে তোমার পিতার পেটে এক লোকমা খাবারও পড়েনি।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে স্বর্ণের পাহাড় দিতে চেয়েছেন, আমি বলেছি হে আল্লাহ! আমি সোনা রূপা চাই না।

এরপর বললেন, হে ফাতেমা! তুমি ঘাবড়ে যেওনা, তুমি খুশী হয়ে যাও। اَمَا تَرْضِيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ سَيِّدَةَ اَهْلِ الْجَنَّةِ তুমি কি এই কথার উপর খুশী নও যে, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের নারীদের নির্বাচিত করেছেন?

এরপর হযরত ফাতেমা (রাযি.) খুশী হয়ে গেলেন, বন্ধ হয়ে গেলো কান্না। আল্লাহ তা'আলা জিব্রাইল (আ.) কে পাঠিয়ে দিলেন, তুমি আমার হাবীবকে বলে দাও। ফাতেমাকে আমি জান্নাতের নারীদের নেত্রী বানিয়েছি।

এক মায়ের কৃতিত্ব

হযরত ফররুখ (রহ.) তাবেঈ ছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় দেশ বিদেশ সফর করতেন। একবার তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। হযরত ফররুখ বলতে লাগলেন, আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য মন মানছে না, আমার মন আর সইছে না, আমি কালই আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছি।

একথা শুনে স্ত্রী বললেন, আমি তো অন্তঃসত্ত্বা, আমার কি অবস্থা হবে?

ফররুখ (রহ.) বললেন, তোমাকে এই গর্ভ অবস্থায় আমি আল্লাহর হাওয়ালা করে যাচ্ছি। আর এই ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছি তুমি খরচ করো।

বেরিয়ে গেলেন হযরত ফররুখ (রহ.)। আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের জন্য। ঘরে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে গেছেন। সময় বয়ে চলেছে আপন গতিতে। এর মধ্যে কত শীত গেলো, বসন্ত এলো, বসন্ত পেরিয়ে গ্রীষ্ম এবং কত দিন গেল সকাল সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে। কিন্তু স্বামী ফররুখ এলেন না। বছর যায় এক দুই তিন করে কেটে যায় ত্রিশ বছর। এরই মধ্যে সন্তান জন্ম নিলো, শিশুকাল পেরিয়ে বাল্যকাল পেরিয়ে গেলো, পিতা ফররুখ এলেন না।

এর মধ্যে এক মা তার সন্তানের লালন-পালন করতে লাগলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। সন্তানের পড়ালেখা, তার দ্বীনী তালীম-তরবিয়ত গভীর মনোযোগের সাথে করতে লাগলেন। এক সময় সন্তান ইসলামী জ্ঞানের

পণ্ডিত হয়ে গড়ে উঠল। চার দিকে তাঁর জ্ঞান পণ্ডিত্যের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে ইলম পিপাসু ছাত্ররা তাঁর কাছে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসতে লাগল। দেখুন! একা এক মা যা করলেন তা বড়ই আশ্চর্য জনক এক কাহিনী। স্বামী আল্লাহর পথে বেরিয়ে গেছেন সেই কবে। ফিরে আসার নাম নেই, তাই বলে মা বসে থাকেননি, সন্তানকে ইলমে দ্বীনের এতবড় পণ্ডিত করে গড়ে তোললেন, যা বিস্ময়কর।

ত্রিশ বছর পর একদিন এক বৃদ্ধ মুসাফির মদীনার রাস্তায় প্রবেশ করলেন। তাঁর অবস্থা বড়ই করুণ, বয়সের ভারে ঝুকে ঝুকে হাটছেন। তিনি হাটছেন আর ভাবছেন, ত্রিশ বছর পর কেউই তো আমাকে চিনবে না। আর যে চিনবে সে কি বেঁচে আছে না মরে গেছে? আমার ঘর কি সেখানে আছে না অন্য কোথাও? এসব চিন্তা করতে করতে হযরত ফররুখ (রহ.) দাঁড়ালেন ঘরের দরজার সামনে।

দেখলেন যে ঘর তো এটা তারই। এক সময় বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলেন। ঘোড়ার আওয়াজ শুনে তাঁর ছেলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছেলে দেখল এক বৃদ্ধ চাঁদের আলোয় বাড়ির উঠানে দাড়িয়ে। ছেলে এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধকে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে জানের দুশমন! তোমার লজ্জা করে না। এ বৃদ্ধ বয়সে অন্যের বাড়িতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করেছো?

একথা শুনে বৃদ্ধ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, হয়ত আমি ভুল জায়গায় এসেছি। আমার ঘর হাত বদল হয়ে হয় তো অন্যের হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমাকে ক্ষমা করো বেটা, আমি ভুল করে ফেলেছি। আমি মনে করেছিলাম আমার ঘর হয়ত এটা।

একথা শুনে ছেলে আরও উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, আরে ভুল তো একটা করেছো, এখন আমার ঘরের মালিকানা দাবী করছো। চলো আমি এখনই তোমাকে কাজীর দরবারে নিয়ে যাব। কাজীই তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এ অবস্থা যখন চলছিল তখন আরেক ঘরে শুয়ে থাকা মার ঘুম ভেঙ্গে গেল চেঁচামেচি শুনে। মা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলেন এ তার স্বামী ফররুখের মত চেহারা। ভালোভাবে দেখে চিনতে পারলেন স্বামীর চেহারা। মা এ অবস্থায় জোরে ডাক দিলেন, হে বেটা রবীয়া। রাবীয়া মায়ের ডাক শুনে চমকে উঠল, মনটা যেন কেমন করে উঠল, দৌড়ে মায়ের কাছে এলো, কি হয়েছে মা? বলল রাবীয়া, মা জানতে চাইলো কে?

রাবীয়া উত্তর দিল, অচেনা এক বৃদ্ধ লোক।

তখন মায়ের দু'চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে গেল, বলল হে জালেম! নিজের জন্মদাতা পিতার সাথে ঝগড়া করতেছো। এই বৃদ্ধ মুসাফির তোমার পিতা। যার জন্য আমার যৌবনকাল শেষ হলো। যাঁর জন্য তোমার মা রাত দিন অপেক্ষার প্রহর গুনছে। যাঁর জন্য তোমার মায়ের মাথার চুল সাদা হয়েছে।

মায়ের একথা শুনে রাবীয়া পিতার পায়ে পড়ে গেল। কাঁদল। পিতা মাথায় হাত দিয়ে সন্তানকে আদর করলেন। রাত শেষ হলো জীবনের গল্প করেই।

ফজরের আযান হলো। উঠলেন পিতা ফররুখ, ছেলেকে খুজলেন, না দেখে জিজ্ঞেস করলেন স্ত্রীকে, রাবীয়াকে দেখছি না, কোথায় সে?

স্ত্রী উত্তর দিলেন, সে তো আযানের আগেই মসজিদে চলে যায়।

পিতা ফররুখ মসজিদে পৌঁছতে জামাত শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি একা নামায পড়লেন। রওযায়ে আতহারে এসে সালাম ও দুরূদ পড়ে সামনে গেলেন, দেখলেন, মসজিদের ভেতর বিশাল জনসমাবেশ, শত শত মানুষ দরস শুনছে। এক যুবক হাদীস পড়াচ্ছেন। দূর থেকে হযরত ফররুখ দেখলেন, বেশি একটা বুঝতে পারলেন না যুবকটাকে। বয়সের চাপ চোখেও পড়েছে, তাই দৃষ্টিও ঝাপসা। চিনতে পারলেন না কে সেই যুবক। তিনি সেখানেই বসে হাদীসের দরস শুনতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধের মত হাদীস পাকের দরস শুনলেন। যখন শেষ হলো, তখন বরাবর যে লোকটি বসা ছিল তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

ভাই সেই যুবকটি কে? যে দরস দিচ্ছিল।

সেই লোকটি একথা শুনে আশ্চর্য হলো। লোকটি বলল, আপনি কি মদীনার বাসিন্দা নন?

হযরত ফররুখ বললেন, ভাই আমি মদীনারই বাসিন্দা, তবে ত্রিশ বছর যাবত এখানে ছিলাম না।

লোকটি বলল, তিনি রাবীয়া– মদীনার বিখ্যাত হাদীস বিশার। ইমাম মালেকের উস্তাদ। ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ। সুফিয়ান সাওরীর উস্তাদ। এই লোক বলেই যেতে লাগলো, তাকে থামিয়ে দিলেন ফররুখ (রহ.)।

বললেন, ভাই কিন্তু আপনি আগে বলুন, তার পিতার নাম কি? লোকটি বলল, তার পিতার নাম ফররুখ সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। একথা শুনে পিতা ফররুখের অন্তরে খুশীর জোয়ার

বইতে লাগল। তাঁর ছেলে আজ কত বড় মুহাদ্দিস। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। আর এর পেছনে যার ভূমিকা সেই তাঁর স্ত্রীকে প্রাণ ভরে দোয়া দিলেন।

বোনেরা দেখুন! স্বামীর অনুপস্থিতিতে এক মা তার সন্তানকে কি সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন, তৈরি করেছিলেন জগত বিখ্যাত মুহাদ্দিস রূপে। এ ঘটনা সব মা-বোনদের জন্য একটি শিক্ষণীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন।

মু'মিন নারীর ঈমানী জযবা

হযরত সালতা ইবনুল আসিম (রহ.) তাঁর ছেলেকে বললেন, বেটা! প্রথমে তুমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হও। কেননা এতে আমি ধৈর্যধারণ করব। আর এ ধৈর্যধারণ করার কারণে জান্নাত লাভ হবে। এরপর আমিও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাব। আর জান্নাতে তোমার সাথে গিয়ে মিলিত হব।

এক সময় লড়াই আরম্ভ হলো, ছেলে প্রথমে শত্রুর মোকাবেলায় লড়াই করতে করতে শাহাদাতের মর্যাদা লাভে ধন্য হলেন। এরপর বাপ এগিয়ে গেল, তিনিও শহীদ হলেন।

যখন এ সংবাদ সিরিয়া পৌঁছল, সে বাপ বেটা শহীদ হয়ে গেছে। তখন সালতা ইবনে আসিম আদাবিয়ার স্ত্রী রাবীয়া আদাবিয়ার কাছে মহল্লার মহিলাগণ শান্ত্বানা দেওয়ার জন্য আসতে লাগল। তখন হযরত রাবিয়া আদাবিয়া বললেন, তোমরা যদি আমার স্বামী সন্তানের শাহাদতের জন্য আমাকে শান্ত্বনা দিতে এসে থাকো, তাহলে চলে যেতে পার।

আর যদি মোবারকবাদ দিতে এসে থাক যে আমার স্বামী ও সন্তান জান্নাতের হকদার হয়ে গেছে, তাহলে মোবারকবাদ দাও। এ শাহাদতের আনন্দে আমি আনন্দিত। পেরেশান নই। এই জন্য যে, আমার স্বামী আমার ছেলে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে জান্নাতের বাসিন্দা হয়ে গেছেন। এজন্য আমাকে ধন্যবাদ দাও।

হে বোনেরা দেখুন! সকল কিছুর উপরে যারা আল্লাহর রাজী খুশীকে প্রাধান্য দিতেন, তারাই তো আমাদের অনুকরণের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারতেন, কিন্তু হায়! আমাদের মা বোনেরা আজ কোথায় কোন জোয়ারে ভাসছে?

হযরত উমর (রাযি.)-এর তাকওয়া

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাযি.) যখন বার্ধক্যে উপনিত। তখন সাহাবায়ে কেরামগণ বলতে লাগলেন, ওমর (রাযি.) বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তাঁর বিশ্রাম দরকার। তাঁর জন্য ভালো খাওয়া দাওয়া দরকার, ভালো পোশাক পরিধান করা দরকার। একজন খাদেম রেখে নিতে পারেন, সেবার জন্য। হযরত আলী (রাযি.) আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযি.) উসমান (রাযি.) তলহা (রাযি.) যুবায়ের (রাযি.) সহ আরও বড় বড় সাহাবী একস্থানে বসে এ ব্যাপারে আলোচনা করছেন। একজন বললেন, আমীরুল মু'মিনীনকে এ কথাগুলো কে বলবে?

অনেক ভাবনার পর তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন উম্মুল মু'মিমীন হযরত হাফসা (রাযি.) কে দিয়েই প্রস্তাব পাঠাবেন। তিনি হযরত উমর (রাযি.)-এর কন্যা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী। সবাই হযরত হাফসা (রাযি.)-এর কাছে এলেন। হাফসা (রাযি.) কে বললেন, আপনি আমীরুল মু'মিনীনকে যখন হাসি-খুশী অবস্থায় দেখবেন, তখন তাঁর সাথে কয়েকটি ব্যাপারে কথা বলবেন, যেমন ভালো খাওয়া-দাওয়া করা। ভালো পোশাক পরিধাণ করা। বয়সের কারণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তাই একজন খাদেম রেখে নিবেন, যাতে আমীরুল মু'মিনীনের খেদমত করতে পারে। যদি এসব কথাগুলো তিনি গ্রহণ করেন, তবে আমাদের কথা বলবেন, যদি গ্রহণ না করেন, তাহলে আমাদের নাম বলার প্রয়োজন নেই।

এরপর একদিন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাযি.) কন্যা হাফসা (রাযি.)-এর ঘরে এলেন। হযরত হাফসা (রাযি.) পিতাকে বললেন, আব্বাজান, আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, আপনার জন্য একজন খাদেম রেখে নিন, যে আপনার খানা পাক করে দেবে, খেদমত করবে। ভালো পোশাক পরবেন, আপনার কাছে অনেক দূর থেকে প্রতিনিধি দল আসে। সময়মত আরামও করবেন।

হযরত উমর (রাযি.) জিজ্ঞেসা করলেন, বেটি তোমাকে একথাগুলো কে বলেছে?

হযরত হাফসা (রাযি.) বললেন, আব্বাজান, প্রথমে আপনি বলুন এই প্রস্তাবগুলো আপনি মানছেন কিনা?

হযরত উমর (রাযি.) বললেন, যারা একথা বলে, তাদের কথা যদি আমার জানা থাকত, তাহলে তাদেরকে মারতে মারতে চেহারা লাল করে দিতাম। হে হাফসা! তুমি তো জানো, তুমি নবীর স্ত্রী, তোমার ভালোভাবেই জানা আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন, অথচ তিনি কোনো দিন পেট ভরে খেতেও পারেননি।

হে হাফসা! তোমার ভালোভাবেই স্মরণ আছে, একদিন তুমি ছোট একটি টেবিলের উপর খানা সাজিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পরিবেশন করেছিলে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দেখে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল, তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, হাফসা খানা নিচে রাখো। আমি নিচেই খানা খাব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা নিচে রেখেই খেয়েছিলেন।

হে হাফসা! তোমার স্মরণ আছে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মাত্র একজোড়া কাপড় ছিল, যা তিনি ধুয়ে ধুয়ে পরতেন। কখনও এমন হত যে, কাপড় জোড়া ধুয়ে শুকাতে দিয়েছেন, এদিকে নামাজের সময় হয়ে গেছে, কাপড় শুকায়নি। এদিকে হযরত বেলাল এসে বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নামাজ! নামাজ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় শুকানোর জন্য অপেক্ষা করতেন, যখন কাপড় শুকাত; তা পরিধান করে নামাজে যেতেন।

হে হাফসা! তোমার ভালোভাবেই স্মরণ আছে, তোমার ঘরে একটা বিছানোর জন্য চট ছিল। তা তুমি এক রাতে চার ভাজ করে দিয়েছিলে যাতে আল্লাহর রাসূল একটু আরাম পান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাফসা, চট দু'ভাজ করে দাও। কেননা এতে শেষ রাতে আমাকে জাগতে বিরত রাখে।

হযরত উমর (রাযি.) বললেন, আয় হাফসা! আমি তো সব দেখেছি, আল্লাহর নবী কত কষ্ট করেছেন। কাঁদতে শুরু করলেন হযরত উমর (রাযি.)। হাফসাও কাঁদছিলেন। এত কাঁদলেন যে চোখের পানিতে কাপড়ের আচল ভিজে গেল।

এরপর খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রাযি.) বললেন, হে হাফসা! শুনে রাখো। আমার এবং আমার স্বাথীদের দৃষ্টান্ত এমনই যে,

তিন পথিক। তিন মুসাফির। একজন এলেন তাঁর নির্দিষ্ট পথে চললেন এক রাস্তায় এবং চলতে চলতে মনজিলে মকসুদে পৌঁছে গেলেন। এরপর দ্বিতীয়জন এলেন তিনিও তাঁর নির্ধারিত পথে চললেন। চলতে চলতে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন। এবার তৃতীয় জন এলেন, আমি সেই তৃতীয় জন। আল্লাহর কসম, আমি আমার নফসের উপর জয়ী হব এবং দুনিয়ার মোহ থেকে বেঁচে চলব। কেননা আমি আমার সাথীদের সাথে মিলে যাব। কিন্তু যদি আমি আমার পথ আলাদা করে নেই, তাহলে আমার সাথীদের সাথে মিলিত হতে পারব না।

প্রিয় বোনেরা! দেখুন, হযরত উমর (রাযি.) কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথীদের সাথে মিলিয়ে দিলেন।

আবু লু'লু' হযরত উমর (রাযি.) কে খঞ্জর মারল, এতে হযরত উমর (রাযি.)-এর পেট কেটে গেল। খাবার কাটা অংশ দিয়ে বেরিয়ে যেত। উমর (রাযি.) বুঝতে পারলেন, যে আর আশা নেই, মৃত্যু আমার শিয়রে। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে ডাকলেন, ছেলেকে বললেন, আবদুল্লাহ যাও, হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে অনুমতি নাও।

আমীরুল মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে সমাহিত হতে চায়। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর দরজায় হাজির হয়ে আরয করলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমীরুল মু'মিনীন এই অনুমতি কামনা করছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে যেন তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাযি.) কেঁদে কেঁদে, বলতে লাগলেন, হে আবদুল্লাহ! এই জায়গা আমি নিজের জন্য রেখেছিলাম, কিন্তু আমি হযরত উমরকে আমার উপর প্রাধান্য দিলাম, যাও আমীরুল মু'মিনীন কে নিয়ে এসো।

আবদুল্লাহ বিন উমর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, সুখবর আব্বাজান, অনুমতি পাওয়া গেছে।

হযরত উমর (রাযি.) বললেন, না এটা হয় না, আমার কথা ভেবেই লজ্জায় হযরত আয়েশা সম্মতি দিয়েছেন। যখন আমার ইন্তেকাল হয়ে যাবে, তখন আমার লাশ হযরত আয়েশার ঘরের দরজার সামনে রেখে আবার অনুমতি চাইবে, যদি অনুমতি দেন তাহলে দাফন করো। অনুমতি না মিললে আমাকে সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করে দিও।

হযরত উমর (রাযি.) শাহাদাত বরণ করলেন। হযরত সুহাইব (রাযি.) জানাজা পড়ালেন। জানাজা তুলে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কামরার সামনে রাখা হলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) বলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমীরুল মু'মিনীন আপনার দরজার সামনে এসে গেছেন, ভেতরে আসার অনুমতি কামনা করেছেন, হযরত আয়েশার ঘরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকাল হয়, আর সেখানেই রাসূলে আরাবী শায়িত আছেন।

একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাযি.) ঘর থেকে বের হলেন, বললেন মারহাবা ইয়া আমীরুল মু'মিনীন, মারহাবা ইয়া আমীরুল মু'মিনীন। অবশ্যই আমীরুল মু'মিনীনের জন্য ভেতরে আসার অনুমতি আছে।

এরপর হযরত আয়েশা (রাযি.) পর্দাবৃত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। হযরত উমর (রাযি.) কে আল্লাহর রাসূলের পাশে দাফন করা হলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন, কিয়ামতের দিন আমি উঠব, আমার ডান দিকে আবু বকর (রাযি.) এবং বাম দিকে উমর (রাযি.) থাকবে এবং বেলাল (রাযি.) আগে আগে আযান দিতে থাকবে।

একটি চমৎকার ঘটনা

এক আল্লাহর অলি হযরত হাশেম (রহ.)। তিনি বলেন, আমি সফরে ছিলাম, সফর করতে করতে এক স্থানে সফর মুলতবী করলাম। আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল। যে স্থানে সফর মুলতবী করেছিলাম এর পাশেই একটি বাড়ি নজরে পড়ল। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম এক মহিলা বসে আছে। আমি বললাম বোন আমি খুব ক্ষুধার্ত। খাবার মিলবে কি?

মহিলা বলল, আমি কি মুসাফিরের জন্য খানা তৈরি করে বসে আছি নাকি? যান, নিজের পথ দেখেন। আমার ক্ষুধা এমন প্রবল ছিল যে, হাঁটার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। তাও রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম। এমন সময় মহিলার স্বামী বাড়িতে আসল। লোকটি আমাকে দেখে মুবারকবাদ জানাল।

জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

আমি উত্তর দিলাম, মুসাফির।

লোকটি বলল, খানা খেয়েছেন?

বললাম না খাইনি।

লোকটি বলল, কেন খাননি?

আমি উত্তর দিলাম, চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি।

লোকটি রাগত স্বরে স্ত্রীকে বলল, জালেম, তুমি তাকে খানা খাওয়াও নাই।

মহিলা উত্তর দিল, কোনো মুসাফিরের জন্য তো আমি খানা তৈরি করে বসে থাকিনি। মুসাফিরদের খাইয়ে আমি আমার ঘরের সম্পদ শেষ করতে পারব না।

মহিলার এ কথার পরও স্বামী তার সাথে খারাপ আচরণ করে নাই।

(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম পুরুষ সে যে নিজের স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করে।)

লোকটি বলল, ঠিক আছে, তুমি তোমার ঘর সম্পদ দিয়ে ভরে রাখো। এরপর লোকটি বকরী জবাই করে গোশত রান্না করে মুসাফিরকে পেট পুরে খাওয়াল। সসম্মানে বিদায় জানালো। এরপর আমি চলতে চলতে সামনে আরেক স্থানে থামলাম। সেখানেও একটি বাড়ি দেখলাম। বাড়ির ভেতর একজন মহিলা বসা ছিল। আমি বললাম, বোন! আমি একজন মুসাফির, কিছু খাবার মিলবে কি?

মহিলা আমার কথা শুনে জোরে বলে উঠল, মারহাবা, আল্লাহর রহমত এসে গেছে। আল্লাহর বরকত এসে গেছে।

সে মহিলা জলদী বকরী জবাই করে রান্না করে খানা আমার সামনে রাখলো। এমন সময় মহিলার স্বামী এসে উপস্থিত।

লোকটি আমাকে দেখেই বলল, তুমি কে?

আমি উত্তর দিলাম, মেহমান।

সে জানতে চাইল খানা কোথা থেকে এসেছে?

আমি উত্তর দিলাম আপনার স্ত্রী দিয়েছে।

আমার কথা শুনে লোকটি রাগান্বিত হয়ে ভেতরের ঘরে গেল। স্ত্রীকে খুব শাসাল। আমি বাইরে থেকে সব শুনছিলাম। লোকটি বলছিল, তোমার লজ্জা করে না মেহমানদের খাইয়ে আমার সম্পদ সব শেষ করে দিতে? তুমি কি আমার ঘর খালি করে ফেলবে?

এ অবস্থায় আমার হাসি এসে গেল। আমি উচ্চস্বরে হাসতে লাগলাম। আমার হাসি দেখে লোকটি বলল, আরে তুমি হাসছো কেনো? হাসার আবার কি হলো?

আমি বললাম, দেখুন! আজকে সকালে আমি একটি বাড়িতে মেহমান হয়েছিলাম। সে বাড়ির মহিলার আচরণ ছিল আপনার মতো। আর সে বাড়ির পুরুষ লোকটির আচরণ ছিল আপনার স্ত্রীর মতো। ঘটনার এমন বৈপরিত্ত দেখে আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

লোকটি বলল সেই মহিলাটি আমার বোন। আর আমার স্ত্রী সে পুরুষ লোকটির বোন।

হযরত হাজেরা (আ.)-এর ধৈর্য

আমরা গরমের মধ্যে কত পেরেশান হয়ে যাই, বেচাইন হয়ে যাই রোদ আমাদের অসহ্য লাগে। অথচ হযরত হাজেরা (আ.)-এর কথা চিন্তা করে দেখুন। তিনি হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর সহধর্মিনী। হযরত ইসমাইল (আ.)-এর মা। তাই তিনি এই উম্মতেরও মা। এই উম্মতের জন্য এই উম্মতের মা হযরত হাজেরা (আ.) কত কষ্ট সয়েছেন।

এর কারণ কি জানেন? কারণ হল আল্লাহ পাক এই উম্মতের ভিত্তির প্রথম ইটটি এমনই মজবুত করে তৈরি করেছেন, যেন কেয়ামত পর্যন্ত সে ভিত্তি ধ্বসে না পড়ে।

হযরত হাজেরা (আ.) কে যখন পুত্রসহ মরুভূমিতে রেখে আসলেন, এরই মধ্যে এক বছর অতিক্রম করেছে। শিশু ইসমাইল (আ.)-এর বয়স এখন দেড় বছর। এক বছর পর একদিন হযরত ইব্রাহীম (আ.) এলেন স্ত্রী সন্তানকে দেখতে।

ইব্রাহীম (আ.) উটটি বসালেন, শিশু ইসমাইলের বয়স দেড় বছর। একটু একটু হাঁটে স্পষ্ট দু একটা কথাও পবিত্র জবান থেকে বের হচ্ছে। এ অবস্থায় শিশু ইসমাইলকে দেখে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর হৃদয়টা শীতল হয়ে যায়। অন্তর জুড়িয়ে যায়। শিশু ইসমাইল, এক পা এক পা করে হাঁটছেন, আবার মরু বালির উপর ধপ করে পড়ে যাচ্ছেন। তাকিয়ে তা দেখছেন আল্লাহর খলীল, অপলক চোখে।

এই দেখে মা হযরত হাজেরা (আ.) অনেক খুশী। তিনি ভাবছেন, এখন সন্তানের মায়ায় পিতা হয়ত সন্তানের সাথেই থাকবেন। এসব ভেবে

হযরত হাজেরা (আ.) স্বামী ইব্রাহীম (আ.) কে বললেন, হযরত! আসুন, সাওয়ারী থেকে অবতরণ করুন, একটু বিশ্রাম নিন।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, হাজেরা! আল্লাহ পাকের আদেশ, সাওয়ারী থেকে অবতরণ করা যাবে না। এভাবেই বসে বসে হাল হাকীকত বর্ণনা করো।

একথা শুনে হযরত হাজেরা (আ.)-এর চোখে পানি এসে গেল। তিনি কাঁদছিলেন, এরপর আচলে চোখ মুছে বললেন, আমার আল্লাহ যা বলেছেন, আমি এর উপর রাজী আছি। আপনি আমায় অনুমতি দিন আমি আপনার পা ধুয়ে দেই। আপনার হাত ধুয়ে দেই, আপনার মাথা ধুয়ে দেই।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, তবে এতটুকুই অনুমতি আছে। এরপর হযরত হাজেরা (আ.) স্বামী ইব্রাহীম (আ.)-এর পা, হাত, মাথা জমজমের পানি দ্বারা ধুয়ে দিলেন।

যাওয়ার সময় ইব্রাহীম (আ.) শিশু পুত্র ইসমাইল (আ.) কে আদর করলেন, বুকে নিলেন, চুমু খেলেন।

এক সময় রওয়ানা হলেন চলে যাওয়ার জন্য।

বিস্ময়কর স্বপ্ন

হযরত শা-বানা (রহ.) স্বপ্নে দেখলেন, জান্নাতকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ফেরেশতা আর জান্নাতীগণ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অভ্যর্থনার জন্য। হযরত শা-বানা (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন কি হচ্ছে? কে আসছে? জবাব এল এক মহিলা আসছে যার জন্য সমস্ত জান্নাতীরা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য।

হযরত শা-বানা (রহ.) দেখলেন, তাঁর বোন শামুনা (রহ.) সাদা উটের উপর সাওয়ার হয়ে জান্নাতের দিকে আসছেন। যখন তিনি জান্নাতের দরজায় এসে পৌঁছলেন, সমস্ত ফেরেশতা এবং জান্নাতীরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

হযরত শাবানা (রহ.) বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, বোন এই মর্যাদা তুমি কি আমলের পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছো?

হযরত শামুনা (রহ.) জবাব দিলেন, আমি গভীর রাতে আরামের ঘুম ত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদত করতাম, তাঁকে স্মরণ করার পুরস্কার স্বরূপ এই মর্যাদা লাভ করেছি।

মাওলানা তারিক জামিল সাহেব বলেন, বোনেরা দেখুন! যে মহিলা রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর স্মরণে সেজদায় পড়ে থাকে তারাই তো জন্ম দিতে পারেন জগত বিখ্যাত আল্লাহ ওয়ালাদের। আর যেই মহিলাদের রাত দিন কাটে গান শুনে, গান গেয়ে, তাদের পেট থেকে তো অবাধ্য নাফরমান সন্তান জন্ম নেবেই।

পাপী মহিলার তওবা

এক বুযুর্গ। তাঁর বুযুর্গীর খবর তখন দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। আর এক মহিলা সেই সময় দেহ ব্যবসা করে পয়সা কামাই করত। জাওয়ান বুড়ো সবাই তার ঘরের সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। পাশে ছিল মদ জুয়ার বিশাল আড্ডাখানা। এই মহিলার পাল্লায় পড়ে শতশত যুবক বিপথগামী হতে লাগল। এলাকার পরিবেশ হয়ে উঠল পাপময়।

এ সংবাদ এই বুযুর্গের কানে পৌঁছল। তিনি অনেকক্ষণ ভাবলেন, এরপর সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনিও সে বদকার মহিলার কাছে যাবেন।

এক রাতে সে বুযুর্গ মহিলার কাছে গেলেন, তাকে নসিহত করে বললেন, দেখো বোন! আজ তুমি যে রূপ সৌন্দর্যের উপর অহংকার করছো, তা অচিরেই শেষ হয়ে যাবে। তুমি সে দিনের কথা স্মরণ করো যেদিন তোমার এ সুন্দর চেহারা পোকার খাদ্য হবে। আর তোমার এই সুন্দর চোখ দু'টিতে কিড়ায় বাসা বাঁধবে, যার মাধ্যমে তুমি শত শত মানুষকে পাপের পথে ডেকে আনছো। আর স্মরণ করো সেই কবর জীবনের কথা যেখানে কবর তোমাকে এমন চাপ দেবে যে তোমার শরীর চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে। হাড্ডি মাংস এক হয়ে যাবে।

বুযুর্গের কথায় এমন প্রভাব ছিল যে, মহিলা এসব কথা শুনে অনুশোচনায় বেহুঁশ হয়ে গেলো। তিন দিন পর্যন্ত বেহুঁশ ছিল। এরপর মহিলা এমন তওবা করল, যে সে সময়ের সব চেয়ে বড় বুযুর্গ হয়ে উঠল।

আল্লাহ তা'আলার রহমতের নমূনা

এক সাহাবী ঘরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে কি খাবার কিছু আছে? স্ত্রী বললেন, না কিছুই নেই। সাহাবী একথা শুনে হয়রান হয়ে গেলেন, ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বের হয়ে গেলেন। স্ত্রী ভাবলেন, হায়

আমাদের এই দৈন্যতা কিভাবে লুকাবো? প্রতিবেশীদের কাছ থেকেই বা কিভাবে লুকাবো যে আমাদের ঘরে কিছুই নেই।

স্ত্রী চুলায় আগুন জ্বালিয়ে দিলেন, যেন প্রতিবেশীরা বুঝতে পারে ঘরে রান্না হচ্ছে। আর এদিকে স্ত্রী খালি চাক্কি ঘুরাতে লাগলেন, যেন প্রতিবেশীরা বুঝতে পারে যে আটা পিষা হচ্ছে। স্ত্রী নিজেদের অভাব লুকানোর জন্য এ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

এক সময় স্ত্রী ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো আমরা ক্ষুধার্ত। তুমি রিযিকদাতা, তুমি আমাদের খানা খাইয়ে দাও। এ কথা বলার সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত বর্ষণ হতে লাগল, তখনও দোয়া শেষ হয়নি। চুলায় চড়ানো খালি পাতিল থেকে সুঘ্রাণ আসতে লাগল। এমন সময় সাহাবী (রাযি.) ঘরে এলেন। নাকে সুঘ্রাণ অনুভব করে চুলার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন হাড়িতে গোশত ভূনা হচ্ছে। আর আটা পিষার চাক্কি থেকে আটা বের হচ্ছে। স্বামী স্ত্রী দুজনে আল্লাহর রহমতের নমুনা দেখে বিস্মিত। তাঁরা আটাগুলো বিভিন্ন পাত্রে জমা করলেন। যখন তাঁরা চাক্কি উঠালো দেখলেন ভিতরে সম্পূর্ণ খালি।

এরপর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে এ ঘটনা বললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি চাক্কি না উঠানো হতো তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত এ চাক্কি থেকে আটা বের হতে থাকত।

অপূর্ব দ্বীনদারী

আল্লামা কারশী (রহ.) ছিলেন একজন উচ্চস্তরের বুযুর্গ। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে একটি কঠিন রোগ দিয়েছিলেন। রোগটি হলো কুষ্ঠ। আর এ কারণে তাঁকে মযযূম বলা হতো। মযযূম শব্দের অর্থ হল কুষ্ঠ রোগী।

আল্লামা কারশী মাযযুম (রহ.) প্রথম জীবনে বিবাহ থেকে বিরত ছিলেন? কারণ তিনি ভাবতেন, আমি বিবাহ করলে যে মেয়ে আমার স্ত্রী হয়ে আসবে তার কষ্ট হবে। তাছাড়া সব মেয়েরাই মনে মনে একজন সুশ্রী সুঠামদেহী পুরুষের আকাঙ্খা করে থাকে। বিভিন্ন বিষয় ভেবে তিনি বিবাহ থেকে বিরত ছিলেন।

কিন্তু এর পরও তিনি ছিলেন নওজোয়ান, বিবাহের সব রকম চাহিদা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। সে চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং বিবাহ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত, তাই তিনি মনের ইচ্ছা পরিবর্তন করে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

একদিন কারশী (রহ.) তাঁর খানকায় বসে আছেন। হাজার হাজার মুরিদ নিয়ে তিনি বসে আছেন। কারশী (রহ.) বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিয়ে করব। সুতরাং তোমরা দ্বীনদার পাত্রী দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করো। আর পাত্রীপক্ষের কাছে আমার অবস্থার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করবে। ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবে আমার কুষ্ঠ রোগের কথা। আমার হাল অবস্থা জানার পরও যদি কোনো মেয়ে আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আসতে রাজী হয়, তবেই আমি খুশী হবো। আর যদি তা না হয়, কোনো মেয়ে আমার কাছে বিয়ে বসেত রাজী না হয়, তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো।

কারশী মাযযূম (রহ.)-এর এ কথা শোনার পর এক মুরিদ মজলিস থেকে উঠে নিজ বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন। বাড়ি পৌঁছে তার অনন্যা সুন্দরী কন্যাকে বললেন, মা তোমাকে আমার পীর হযরত শাইখ কারশী (রহ.)-এর সাথে বিয়ে দিতে চাই। তিনি কুষ্ঠ রোগী এবং তার সমস্ত হাল অবস্থা বর্ণনা করলেন মেয়ের কাছে।

কতক্ষণ সময় কেটে গেলো নিরবে, বাপ মেয়ে চুপ। কোনো কথা নেই। বাপ মেয়ের জবাবের অপেক্ষায় আছেন। মেয়ে ছিলো অত্যন্ত দ্বীনদার এবং বুদ্ধীমতী। মেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে জবাব দিলো, আব্বাজান আমি শাইখ কারশী (রহ.)-এর সমস্ত হাল অবস্থা অবগত হওয়ার পর সন্তুষ্টচিত্তে এ বিয়েতে রাজি।

মেয়ের জবাব শুনে পিতার আনন্দ আর ধরে না। পিতা আনন্দচিত্তে কারশী (রহ.)-এর দরবারে গিয়ে বললেন, হযরত! একজন দ্বীনদার সুন্দরী কন্যা আপনার বিবাহে আসতে রাজি হয়েছে।

কারশী (রহ.) জানতে চাইলেন, মেয়েটি কে? তাকে কি আমার পূর্ণ অবস্থার কথা বলেছো? আমার কুষ্ঠ রোগের কথা কি তাকে বলেছো?

মুরিদ জবাব দিলেন, জি হযরত, মেয়েটি আমারই আদরের কন্যা। তার বিবাহের বয়স হয়েছে। আপনার সমস্ত হাল হাকীকত শুনে সে সন্তুষ্ট

চিত্তে আপনার সাথে বিবাহে রাজি হয়েছে এবং বলেছে, আমি এমন একজন বুযুর্গের খেদমত করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

এরপর একদিন শুভক্ষণে হযরত কারশী (রহ.)-এর সাথে সেই পূণ্যবতী মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন হলো।

হযরত কারশী (রহ.) ছিলেন কারামতের অধিকারী একজন অলৌকিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বুযুর্গ। তাই তিনি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার স্ত্রী, সে আমার হাল অবস্থা জানার পরও আমার সাথে বিয়েতে রাজী হয়েছেন এটা তার দ্বীনদারী ও উচু মন মানষিকতার লক্ষণ। হে আল্লাহ! আমার কুষ্ঠু রোগের কারণে তার কষ্ট হবে। তাই আমি যখন আমার স্ত্রীর কাছে যাবো তখন যেন আমার শরীর সুন্দর হয়ে যায়। শরীরে কুষ্ঠ রোগ না থাকে। আমার স্ত্রী যেন আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। আল্লাহ তা'আলা কারশী (রহ.)-এর দোয়া কবুল করে নিলেন।

শাইখ (রহ.) স্ত্রীর কাছে গেলেন, শরীরে কুষ্ঠ রোগের কোনো লক্ষণ তখন ছিল না। সুন্দর সুদর্শন যুবকে পরিণত হলেন। কিন্তু কারশীর স্ত্রী এ নেককার নারী এত সুন্দর সুদর্শন পুরুষকে কাছে আসতে দেখে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? এখানে কেনো এসেছেন?

হযরত কারশী (রহ.) স্ত্রীর মুখে এ প্রশ্ন শুনে বিব্রত বোধ করলেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি কারশী, তোমার স্বামী। নেককার স্ত্রী বললেন, আপনি আমার স্বামী নন। আপনি এখান থেকে চলে যান। শাইখ কারশী (রহ.) স্ত্রীকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বললেন, যে আমিই তোমার স্বামী, আজই তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে।

নেককার স্ত্রী বললেন, আমার পিতার কথামতো আমার স্বামী কুষ্ঠ রোগী, কিন্তু আপনার শরীরে এর কোনো চিহ্নও নেই। আপনি একজন সুন্দর সুস্থ মানুষ।

শাইখ কারশী (রহ.) এবার স্ত্রীর কাছে সব কথা খুলে বললেন যে, তোমার কষ্টের কথা ভেবে আমি আল্লাহর কাছে কুষ্ঠ রোগ থেকে সাময়িক সময়ের জন্য মুক্তির দোয়া করেছি, আল্লাহ তা কবুল করেছেন। আমি যখনই তোমার সামনে আসব তখনই আমার শরীর সুন্দর সুদর্শন হয়ে যাবে।

শাইখ কারশী (রহ.)-এর কথা শুনে দ্বীনদার আল্লাহ প্রেমিক স্ত্রী যে সুন্দর শিক্ষণীয় জবাব দিয়েছিলেন এটাই মূলত এ ঘটনার মূল আলোচ্য বিষয়। তাঁর সে জবাব সারা মুসলিম নারীদের জন্য শিক্ষণীয় ও উপদেশ হয়ে থাকবে।

স্ত্রী জবাব দিলেন, বড়ই আফসোস ও পরিতাপের বিষয়, আপনি আমার একান্ত নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়্যত ও এর সাওয়াব নষ্ট করে দিলেন। আমি শুধু আপনার বিবাহে আসতে সম্মত হয়েছি এ কারণে যে, আপনি মাযুর ও অপারগ, আপনার খেদমত করে যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। দুনিয়ার কোনো ভোগ-বিলাস ও আনন্দ ফুর্তি আমার লক্ষ্য ছিল না। সুতরাং আপনি যদি আপনার পূর্ব অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হতে পারেন, তাহলে আমি আপনার খেদমত করতে রাজি আছি। নয়তো আমাকে তালাক দিয়ে দিন।

একথা শুনে শাইখ কারশী (রহ.) নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যাতে তাঁর শরীরের পূর্বের অবস্থা ফিরে আসে। কারশী (রহ.) কে আল্লাহ পাক পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন।

এ অবস্থায় সে নেককার মহিলা কারশী (রহ.)-এর সাথে সংসার করতে লাগলেন। ভালোবাসা পূর্ণ দ্বীনদারী পরহেজগারীর এক উজ্জ্বল নিদর্শন ছিল বুযুর্গদের সংসার।

কি বিস্ময়কর সে দ্বীনদারী, কি অপূর্ব সে ইসলাম! কত উচ্চাঙের সেই মন-মানসিকতা। আজ সমাজের এই ভোগ-বিলাস আরাম-আয়েশ প্রিয় নারী সমাজ এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে যে, স্বামীকে ভক্তি করতে হবে। তার অর্থ সম্পদ, সৌন্দর্য, বংশ দেখে নয়, তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হবে তার আমল-আখলাক পরহেজগারী দেখে। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন

সমাপ্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কপিরাইট অফিস

স্বত্বাধিকার নিবন্ধভুক্তির প্রমাণপত্র

কাউসার বিন নুরুদ্দীন

"মহিলাদের মুক্তির পথ"

প্রচ্ছদ

কাউসার বিন নুরুদ্দীন ১৬৮৮০

২০১৫ এপ্রিল ষোল

রেজিস্ট্রার

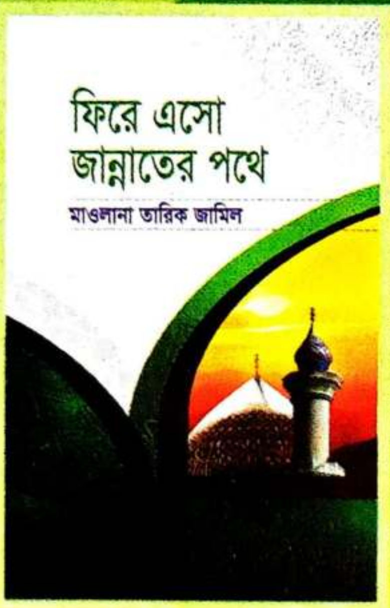

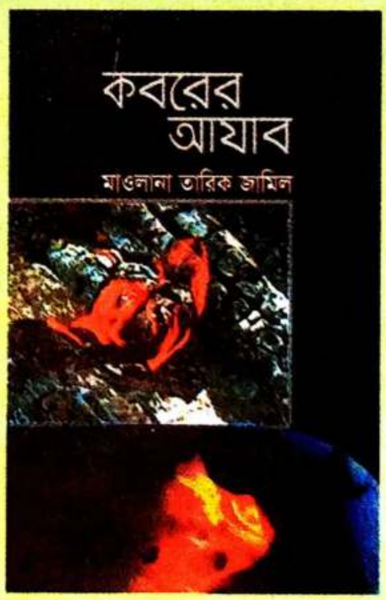

বিন্‌নূরী লাইব্রেরী

৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট, ঢাকা।